www.arisumu.com

A-G.

# পটলা জিন্দাবাদ

শক্তিপদ রাজগুরু

Scanned By Arivirus

প্রাপ্তিস্থান
ভৈরব পুস্তকালয়
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

## ঃ এতে যা আছে ঃ


| | |
|---|---|
| পটলার আকাশ ভ্রমণ | ১ |
| পটলার ইন্দ্রজাল | ১১ |
| পটলার অগ্নিপরীক্ষা | ২৫ |
| হোঁৎকাদার সেবাব্রত | ৪৯ |
| হোঁৎকার দেবসেবা | ৬২ |
| পটলার বনভোজন | ৭৭ |
| হোঁৎকার ভ্রমণ কাহিনী | ৯০ |
| পটলের মুক্তিপন | ১০৫ |
| লঙ্কাদহন পালা | ১১৪ |


www.arisumu.com

# পটলার আকাশ ভ্রমণ

আকাশ ভ্রমণ

আকাশ ভ্রমণ মানেই পয়সা খরচের ব্যাপার। বহু কাণ্ডের নায়ক পটলা যে নিখরচায় আকাশে উড়ল তার পেছনে কারণ দুটি—ব্যবসা আর গ্যাস।

---

পটলা ফাইনাল পরীক্ষায় রচনাটা লিখেছিল দারুণ। বাংলার

টিচার জগৎবাবু সেদিন মুক্তকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, 'এসে' লিখেছিস বটে পটলা। খুব ভাল লিখেছিস। লেখাটাকে যদি কাজের সঙ্গে ঠিক মিশিয়ে নিতে পারিস দারুণ হবে রে।

পটলা সেই থেকেই কথাটা ভেবেছে গভীরভাবে। কথায় কথায় বলে—বাণিজ্যই করতে হবে।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মাঠে সেদিন হোঁৎকা বলল, ওসব তালি বালি কথা ছাড় পটলা!

পটলা বলল, কি বলছিস হোঁৎকা? জগৎ স্যার ঠিকই বলেছেন, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। বাঙালী জাতটা এই কথাটা বুঝল না। ব্যবসা-বাণিজ্য ক-করতে যেন লজ্জা পায় এরা!

পটলার অবশ্য এই কথা বলার অধিকার আছে। কারণ পটলার বাবা, কাকারা সবাই ব্যবসাপত্র করেন। একটা ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, করাত কল এসবও আছে। আর ব্যবসা বাণিজ্য করে ওরা যে লক্ষ্মী লাভ করেছেন সেটা ওদের ঘরবাড়ি, গাড়ি, কারখানা দেখলেই বোঝা যায়। পটলাও তাই দরাজ দিল হয়েই আমাদের পঞ্চভূতের (ওটা দুষ্টুজনে বলে) পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের জন্য খরচাপত্র করে। আলুকাবলী, মালাই বরফ, ঝালমুড়ি মায় মদনার 'তৃপ্তি' কাফের চা-টোস্ট, ওমলেটের খরচাও দেয়। এছাড়া ক্লাবের খেলাধূলা, ফ্যাংশন এসব তো লেগেই আছে, সেখানেও কামধেনুর মতই পটলাকেই দোহন করি আমরা।

এবার সমস্যাটা হয়েছে অন্যরকম।

ইডেন উদ্যানে ইংল্যাণ্ড থেকে সেরা ক্রিকেট টিম আসছে শীতের মরশুমে। তাদের জোর খেলা হবে ভারতের টিমের সঙ্গে। হোঁৎকা ধরেছে এই ক্রিকেট খেলা দেখতেই হবে। হোঁৎকা ইদানীং বোলিং শুরু করেছে আমাদের ক্লাবে। আমিও ব্যাট করি, পাড়াতে টুকটাক সুনামও হচ্ছে। তাই আমিও জানাই—তা মন্দ হয় না। এ খেলা দেখা তো নয় ক্রিকেটের পাঠ নেওয়া। কত রকম নতুন ধরণের মার দেখা যাবে।



হোঁৎকাও সায় দেয় তার দেশজ ভাষায়—ঠিক কইছস।

ফটিক ক্ল্যাসিক্যাল গান গায়। তবু বলে সে, টেস্ট ক্রিকেট না দেখলে জাতেই ওঠা যায় না। দেখবি তাবড় ফিল্মি লোকজন, গাইয়ে-বাজিয়েরাও মাঠে যায়। একটা পাবলিসিটি তো চাই রে—

গোবরা ধমকে ওঠে—খেলার কি বুঝিস হোঁৎকা, তার চেয়ে ওই টাকায় চল দীঘায় বেড়িয়ে আসবি।

পটলার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। বলে, ওই টাকায় বাণিজ্য ব্যবসা কিছু ক-করে টাকাটা বাড়িয়ে সেই লাভ থেকে দ-দীঘায় চল।

হোঁৎকা ধমকে ওঠে—তর মাথায় বাণিজ্যের ভূত চাপছে আবার।

পটলার মাথায় মাঝে মাঝে এমনি নানা ধরনের ভূত চাপে। সেবার কবি হতে গিয়ে তো গঙ্গায় ডুবতে গেছিল, পাড়ার ফ্যাংশন করে সংস্কৃতির সেবা করার ভূত চাপতে সেবার মার খেয়ে বিছানায় পড়েছিল বাড়িতে। তারপর সাধু হয়ে হিমালয়ে গিয়ে যা ফ্যাসাদ পটলা বাধিয়েছিল তাও সকলেই জানে। গতবার মুরগীর পোলট্রি করতে গিয়ে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডই বাধিয়েছিল। এবার আবার ব্যবসার ভূত ঘাড়ে চেপেছে পটলার। ওই রচনা লেখার পর থেকে পটলা বাণিজ্য করার স্বপ্নই দেখেছে।

কিন্তু মূলধন তো সামান্য। মাত্র কয়েক শো টাকা।

এদিকে হোঁৎকা বলে, ক্রিকেট দেখানোর মুরোদ নাই—তগোর ক্লাবে খেলুম না। কুলেপাড়া এসপোর্টিং কইছে ক্রিকেট দেখাইবো, ওগোর টিমেই যামু—

এ যেন পটলারই অপমান। আর হোঁৎকা বিহনে পঞ্চপাণ্ডবদের ক্লাবের অবস্থা হবে ভীমহারা পাণ্ডবদের মতই।

তাই পটলা বলল, তোরা যা। আমি যাচ্ছি না।

গোবরা পটলার ভক্ত। সে বলল, আম্মোও পটলার সাথেই থাকছি।

পটলা ওর কথায় খুশি হয়ে বলল, তাই থাক গোবরা। তোর

মামার দোকানদারি করিস, তুই ব্যবসা বুঝবি। তোরে নিয়েই বড়দিনের মেলাতে একটা ব্যবসাপত্র করব।

গোবরা দর হাঁকে—রাজি, তবে ফিফটি ফিফটি।

অর্থাৎ আধাআধি বখরা চাই তার। পটলা এহেন পার্টনার পেয়েও খুশি। খুশির চোটে পটলার জিভটা আলটাকরায় সেঁটে গেছে। বলে সে—ক-করেক্ট।

হোঁৎকা বলে, টেস্ট ক্রিকেট খেলা দেখানর জন্যে লাঞ্চ ও খাবার লাগবো, সমী খরচাটা হিসাব কইরা নিয়া নে পটলার ক্যাস থনে। বাস ভাড়াডাও।

হোঁৎকা একেবারে পেশাদার খেলোয়াড়ের মতই মোচড় মারছে। কিন্তু করার কিছু নেই। সামনে টিমের ফাইন্যাল খেলা, এখন টিম রাখতে গেলে পটলাকে এসব যোগাতেই হবে।

আমি, হোঁৎকা আর ফটিক তিনজনের টেস্ট-এর তিনখানা টিকিট চাই। হোঁৎকা বলে পটলাকে—তর ছোটকারে ধর, আমিও পশুদারে ক্যাচ করছি।

টেস্ট খেলার টিকিট-এর জন্যে যে সারা কলকাতার তাবড় মানুষ হন্যে হয়ে থাকে তা জানা ছিল না।

পশুপতি বাগকে দেখেছি পাড়ার যেকোন মিটিং-এ হাত-পা নেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে। বিরাট নেতা। সেদিন ওর বাড়িতে গিয়ে দেখি বিরাট লাইনই লেগেছে।

পশুদা আমাদের চেনেন। কিন্তু পশুদা আমাদের আড়ালে ডেকে বললেন, টিকিট আর নেই রে। পঞ্চাশের টিকিট একশো পঞ্চাশে ব্ল্যাক হচ্ছে, কোথায় পাব টিকিট?

হোঁৎকা বলে,—ঠিক আছে। এবার ভোটের মিটিং করতি যাইবেন মাথায় কড়াই বাইন্ধা!

পশুপতিদাদা অবাক হন—কেন?

হোঁৎকা ঘোষণা করে—ইট খাইবেন। আর মঞ্চখানাও হুড়মুড় কইরা যাতে ভাইঙা পড়ে তার ব্যবস্থাও করুম! চল সমী—



হোঁৎকা এবাউট টার্ন করে চলে আসছে, পশুদার ডাকে থামল। পশুপতিদা পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, চটছিস কেন?

হোঁৎকা জানায়—চটুম ক্যান! যা হইব তাই কইছি।

পশুপতিদা শেষ অবধি ড্রয়ার খুলে বেশ কিছু টিকিট বের করে বলে—কতজনকে দিতে হবে রে? থানা-পুলিশ, কর্পোরেশনের কর্তারা, পাড়ার দু-চারজনকেও দিতে হবে। তোরা এসেছিস, নে তিনখানা। তবে হানড্রেড করেই দিবি, খরচা-টরচা করে তবে তো বের করতেহয়েছে।

শেষ অবধি হোঁৎকা তিনখানা টিকিটের জন্য দুশো টাকা দিয়ে বের হয়ে এসে গজরায়—হালায় ফিফটি রুপিজ জক দিছে, ওর মিটিং করার মজাখান দেখাইমু ইবার।

তবু পেয়েছি তো।—আমি হোঁৎকাকে সান্ত্বনা দিই।

পটলাও বিপদে পড়েছে। ক্লাব ফাণ্ড থেকে আমাদের টিকিট, লাঞ্চ ইত্যাদির খরচা মিটিয়ে বাকি আছে মাত্র শতখানেক টাকা। ওতেই যা হোক বাণিজ্য কিছু করে দু-আড়াইশো টাকা তুলে আনতে হবে।

গোবরাই এখন পটলার ডানহাত হয়ে গেছে।

পটলা বলে, ওদের কাছে প্ল্যানট্যানগুলো ভাঙবি না গোবরা। ওদের দেখিয়ে দেব একশো টাকায় কি করে ব্যবসা করতে হয়।

গোবরাও মিইয়ে গেছে। চোখের সামনে দিয়ে হোঁৎকা—আমি-ফটিক এতগুলো টাকা আদায় করে সেজেগুজে ব্যাগে পাঁউরুটি, ড্রাই আলুর দম, সিঙ্গাপুরী গ্রীন কলা, কমলালেবু, ডিমসেদ্ধ (টেস্ট ক্রিকেট দেখতে গেলে এসবও লাগে) নিয়ে টা টা করে বাসে উঠে চলে যাচ্ছি। ও ব্যবসা দেখাতে পড়ে রইল।

পটলা এহেন চুপসে যাওয়া গোবরাকে বলে—উদ্যম। বুঝলি গোবরা—উ-উদ্যমই ব্যবসার মূলধন।

গোবরা বলে ওঠে—থাম পটলা, একশো টাকায় উদ্যম ঢেলে দিলেও ব্যবসা হয় না। গ্যাস দিবি না।

পটলা এবার যেন পথ পায়। গোবরাকে জড়িয়ে ধরে।—ক-ক্লরেক্ট! গ-গ্যাস! গ্যাসেরই ব্যবসা করব, দ-দে-দেখে-নিবি।

গোবরা বলে, গ্যাস-এর ব্যবসা! কাগজে দেখিসনি ভূপাল শহরের কত লোক গ্যাসে মরেছে, আবার তুই গ্যাস ফ্যাসের বিজিনেস করবি?

পটলার ব্রেন তখন দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করেছে। বলল,-ধ্যাৎ। ওসব গ্যাস কেন হবে। গ্যাস বেলুন বিক্রী করব। নাম্বার ওয়ান—ইয়া জাম্বো সাইজের গ্যাস বেলুন বিক্রী করতে হবে বড়দিনের মেলায়। মৌলালির মোড়ে একেবারে নতুন ক-কৌশলে।

গোবরা অবাক হয়—সেকি রে! গ্যাস বেলুনের ব্যবসা?

পটলা ব্যবসার গন্ধ পেয়েছে। বলে সে, কোন ব্যবসাই নিন্দের নয়।

তারপরই তার সেই লেখা রচনা থেকে জ্ঞান দেয়। আলামোহন দাশ—বিরাট শিল্পপতি, প্রথমে কি বেচতেন জানিস? মুড়ি-মুড়কি। দুধরমল লাখোটিয়া কলকাতা এসেছিল অনলি উইথ এ লোটা অ্যাণ্ড কম্বল।

গোবরা বলে, তুই তাহলে এই করবি?

স-সিওর। পটলা ঘোষণা করে।

সারা কলকাতায় সাড়া পড়ে গেছে।

এখানে রোজই মেলা বসে, একাধিক মেলা। লোকজন কাচ্চা-বাচ্চাদেরও ভিড় জমে সেখানে। কলকাতায় তখন ক্রিকেটপর্ব চলেছে ইডেন উদ্যানে। সেখানে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মেয়েরা গাড়ি থেকে উলের বোঝা নিয়ে নামছে, দিনভর উল বুনবে। মাঠে রোদপীঠ করে, কাটলেট, কলা, কমলালেবু, আইসক্রীম ধ্বংস করবে। এদিকের গ্যালারিগুলো ঠাসা। লোকজন অনেকে মাঠে ঢুকতে না পেরে ট্রানজিস্টার, টি ভি-র সামনে হত্যা দিয়ে প্রতিটি মারে শিহরণ তুলছে। অফিস, কাছারি ফাঁকা। সারা জাতটা যেন ক্রিকেটই ধ্যান জ্ঞান করে মেতে উঠেছে।



বাকিরা এসে ভিড় জমিয়েছে মৌলালির মোড়ে। সেখানে বসেছে বড়দিনের বিরাট মেলা। ট্রাম, বাস প্রায় বন্ধ। দোকান পশার বসেছে, বিরাট একটা মূর্তিও গড়েছে সান্টা ক্ল্যজের। যীশুখ্রীস্টের উৎসব না ওরই পুজো হচ্ছে কে জানে, নাগরদোলা—চপ, পাঁপড়, কেক সবই বিক্রী হচ্ছে।

তার মাঝে এসেছে পটলচন্দ্র উইথ গোবরা।

একটা ঠেলাগাড়িতে বিরাট অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়া করে এনেছে, আর তার থেকে নল দিয়ে গ্যাস পুরে পেল্লায় ছোটখাট ফুলসাইজ বেলুনে গ্যাস পুরে বিক্রী করছে। পটলার বুদ্ধিটা এদিকে ভালই খোলে। সে পরেছে একেবারে বুড়ো সান্টা ক্ল্যজের মত পোশাক। এমনি মুখমোড়া জরির টুপি, ফুলপ্যাণ্ট। আর গোঁফও লাগিয়েছে জব্বর।

গোবরা চিৎকার করে—অনলি ওয়ান রুপী। সান্টা ক্ল্যজের উপহার—গিফট ফর অল—এক টাকা!

ওই বিচিত্র পোশাক দেখে আর বিশাল বেলুন দেখে সবাই কিনছে। পটলা খুঁজে খুঁজে বিশাল আকারের বেলুনই এনেছে। রমরম বিক্রী হচ্ছে। গোবরা মাল দিয়ে শেষ করতে পারছে না। পটলাও দেখছে আমদানীর বহর। খুশিভরে গাড়ির ওপর উঠে গোটা বিশ-পঁচিশ বিশালাকায় গ্যাসভর্তি বেলুন হাতে নিয়ে দাপাচ্ছে—কাম অন বেবিজ!

পটলাকে দেখা যায় না, বেলুনে ঢেকে গেছে। গোবরা আরও কয়েকটা বেলুনে গ্যাস পুরে ওর হাতে সুতোগুলো জড়িয়ে দেয়।

দারুণ বিক্রী চলছে।

হঠাৎ কাণ্ডটা বেধে যায়। ওই অসংখ্য গ্যাস বেলুন বাঁধা পটলার বিচিত্র পোশাকপরা দেহটা যেন হাল্কা হয়ে গেছে। গ্যাস বেলুন-পুঞ্জের টানে পটলার ছোট দেহটা একটানে সাঁই করে গাড়ি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে শূন্য পথে উঠে যায়। সারা মেলায় হৈ চৈ

কলরব ওঠে। সাণ্টাক্ল্যজ যেন শূন্য পথে আসছে ধরাধামের শিশুদের জন্য উপহার নিয়ে। বিকট উল্লাসধ্বনি ফেটে পড়ে।

ওদিকে পটলাও অসংখ্য গ্যাসভর্তি বেলুনের টানে ওপরে—আরও ওপরে উঠছে। ভাসছে হওয়ায়। নিচে দেখা যায় কলকাতার রাস্তা —উল্লসিত লোকজন, ছেলেদের ভিড়। মেলার দোকান পশার। এইবার পটলা বুঝতে পারে বিপদের গুরুত্বটা। কিন্তু তার করার আর কিছুই নেই।

হাওয়া দিচ্ছে—পটলার অসংখ্য রং বেরং-এর বেলুন জড়ানো সাণ্টা ক্ল্যজরুপী দেহটা শূন্য পথে হাওয়ার বেগে ভাসতে ভাসতে চলেছে। নিচে দেখা যায় কলকাতা শহরের বাড়ি, ধর্মতলার ট্রাম লাইন, লোকজন। সবাই চিৎকার করছে। কিন্তু থামার উপায় নেই। পটলা ভেসে চলছে হাওয়ার টানে। ইডেন গার্ডেন, গড়ের মাঠ গঙ্গার দিকে।

এবার ভয় হয় পটলার, যদি মাঝ গঙ্গায় পড়ে নির্ঘাৎ ডুবে মরবে। আর অন্যত্র পড়লে হাত পা ভাঙবে। চিৎকার করছে পটলা। ব্যবসা করতে গিয়ে এমনি শূন্য পথে উধাও হতে হবে ভাবেনি, নিচে কলকাতার রাস্তায় তখন ভিড় জমে গেছে।

গোবরা চিৎকার জুড়ে দুহাত তুলে দৌড়চ্ছে। কে একজন বলে, মঙ্গলগ্রহের লোক নাকি কলকাতা 'রেড' করতে এসেছে।

হৈ চৈ কাণ্ড। পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে চলেছে, কিন্তু পটলা তাদের নাগালের বাইরে কলকাতা শহরের প্রাসাদমালার ওপরে ভেসে চলেছে রং বেরং-এর বিরাট বেলুন পুঞ্জের মাঝে বিচিত্র পোশাকে।

সামনে দেখা যায় কার্জন পার্ক, তার ওদিকে সেই ক্রিকেটতীর্থ ইডেন গার্ডেনে তখন ইংল্যাণ্ড ঠেসে পেটাচ্ছে ভারতবর্ষকে, তারও ওদিকে গঙ্গার বিস্তার। পটলা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করো,—বাঁচাও। নামাও—



তার চিৎকার নিচের ধাবমান জনতার কোলাহলে শোনাও যায় না। হাওয়ার টানে কার্জন পার্ক—লাট ভবন পার হয়ে হেলতে, দুলতে দুলতে চলেছে সাণ্টা ক্ল্যজরূপী পটলা।

এবার ফাঁকায় পেয়ে পুলিশও শূন্যে দু-একটা ফায়ার করেছে। হঠাৎ পটলা এক ঝটকায় নেমে পড়ে কিছুটা। ওদের গুলি লেগেছে কয়েকটা বেলুনে, বেলুনগুলো দুমদাম করে ফাটছে, পটলাও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চোটে এবার নিচের দিকে নামছে এক এক ঝটকায়। যেন ল্যাণ্ড করতে চলেছে ওই জীবটা।

নিচেই ক্রিকেট মাঠ। সেখানের খেলা থেমে গেছে। কলরব করছে সারা দর্শককুল। ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেনও এবার জয় এনেছে তার হাতের মুঠোয়। আর এই সময় ওই সাণ্টা ক্ল্যজই সেই জয় যেন এনে দিয়েছে—সবুজ মাঠের মধ্যে গ্যাস বেলুন ফাটার ফলে পটলা ছিটকে পড়ছে।

না। পড়ে না।

ভারতের ফিল্ডাররা পতনশীল পটলাকে লুফে ফেলে। দৌড়ে আসে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন। 'সাণ্টা ক্ল্যজই বড়দিনে তাদের জন্য জয়ের উপহার এনেছে। নাহলে ভারতবর্ষের মত মজবুত টিমকে তারা হারাতেই পারতো না।

পরদিন কাগজেই খবরটা পটলার ছবি সমেত বের হয়। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মাঠে কাগজখানা মেলে ধরে পটলা বলে—দ-ত্যাখ। বা-ব্যণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী কথাটা সত্যি কি না।

আমরাও এবার ওর কথাটা মানতে বাধ্য। কাল স্রেফ গ্যাস বেলুন বেচেই সাড়ে তিনশো টাকা লাভ করেছে, আর সাণ্টা ক্ল্যজ বেশী পটলাকে নিয়ে মাঠে যা হৈ চৈ পড়েছিল তা আমরা স্বচক্ষেই দেখেছি। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন নাকি তুকতাকে বিশ্বাস করে। পটলার উপস্থিতি তাদের কাছে শুভ লক্ষণই। তাই ওরা বাকি দুটো খেলার

দিনে পটলাকে তাদের খরচে দিল্লি, বোম্বাই-এ নিয়ে যাবে। আর ও দুটোতে যদি জেতে তাহলে নাকি ওকে লণ্ডনেই নিয়ে গিয়ে রাখবে।

হোঁৎকা বলে, তয় বুদ্ধিখ্যান জব্বরই করছস পটলা। যা দেশভ্রমণ কইরা আয় গিয়া বিনা পয়সায়।

পরক্ষণেই হোঁৎকা ফর্দ করে—ফটকে যা মদনার তৃপ্তি কেবিনে কই দে—পাঁচখান ডবল ডিমের ওমলেট আর টোষ্ট যেন পাঠাই দেয়। জলদি যা; হ্যাঁ, কাঁচা লঙ্কা দিতি কইবি! পটলা—ট্যাকা দে ওরে।

হোঁৎকা যুৎ করে বসলো ব্রেকফাষ্ট করার জন্য। পটলাকে আবার কিছু টাকা খরচ করতে হল।

———

পটলা ইদানীং ম্যাজিক নিয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে ওর কাকার কাছে বহরমপুরে গিয়ে ওখানে এক সুবীরকুমার না কার যাদুর খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে ওই দিকে ঝুঁকেছে বেশ কিছুদিন থেকে।

সেই যাদুকরের তাঁবুতেই যাতায়াত করে বেশ কিছু খেলা শিখেছে, হাত সাফাই, তাসের খেলা—এসব শিখে এরপর বাক্স থেকে বের হবার খেলা প্রাকটিস করছে। একদিন নাকি আলমারীতে বন্ধ হয়ে নিজেই দমবন্ধ হয়ে টেসে যাবার উপক্রম হতে ওর ছোটকাকা আলমারী থেকে বের করে দু চারটে চড় চাপড় দিয়ে বাসের

টিকিট কেটে ওকে আবার তার বাবা মায়ের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছিল।

কিন্তু পটলার ঘাড় থেকে ভূত তবু নামেনি। এখানে এসেও দিনরাত ওই সব ম্যাজিকের নক্সা হচ্ছে, বটতলার বইএর দোকান থেকে লাল কালিতে ছাপা বহু পবিত্র ম্যাজিকের বইও এনেছে। ও বলে—নি-নিজেই ভ্যানিস্ হতে পারি, অন্‌লি একটা কোকিলের ডিম পেলে। কোকিলের ডিম স্বর্ণভস্মে রঞ্জিত করে মুখে রাখলে ম—মানুষ ত—ভ্যানিস হয়ে যায়।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তরে ভ্যানিস্ করতি এত সব লাগ্‌বো না। ফিনিশ কইরা তরে ভ্যানিস্ করুম। ক্লাবের ফ্যাংশন—টাকা পয়সার দরকার তাই দ্যাক এহন ওসব ছাইড়া।

আমরাও ভাবনায় পড়েছি। ক্লাবের ডে টু ডে খর্চাও কম নয়। আলুকাবলি, ঝালমুড়ি, ফুচ্‌কা, নকুলের দোকানের চা এসবের পয়সা যোগায় পটলাই। সেই পটলাই যদি এখন পি-সি সরকার এর মত ম্যাজিসিয়ান হয়ে ওঠে, দেশ বিদেশে ঘোরে আমাদের কি হবে!

কিন্তু পটলা এখন ম্যাজিসিয়ান হয়ে গেছে। বাড়ির দু'তিনটে বিড়ালের উপর নাকি হিপ্‌নোটিজম চালিয়ে তাদের কায়দা করেছে। আর তাদের করাতকল থেকে একটা ছোট মটর লাগিয়ে করাত দিয়ে এবার কাউকে দুখণ্ড করে আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টাও করবে।

এহেন পটলা আমাদের ক্লাবের আর্থিক অনটনের কথা শুনে বলে—কু-কুছ পরোয়া নাই। এবার রাসের মেলায় ম্যাজিক দেখিয়ে ক্লাবের জন্য ম্—মোটা টাকা তুলে দোব। ত—তোরা একটু হেল্প করলেই হয়ে যাবে।

অবাক হই—তুই ম্যাজিক দেখাবি?

হাসে পটলা বিজ্ঞের মত। বলো স—সিওর। এতদিন কি শিখলাম ত—তাহলে!



www.arisumu.com

হোঁৎকা বলে—কিন্তু তাতে তো খর্চা লাগ্‌বো। তাঁবু-এস্‌টেজ-যন্ত্রপাতি, বাদ্যি বাজনা—

ফটিক একপায়ে খাড়া। সে সঙ্গীত বিশারদ। এহেন মৌকা ছাড়তে সে রাজী নয়। ফটিক—বলে মিউজিক এর জন্য ভাবতে হবে না। ওসব করে দোব। বাঁশি-বেউলো-তবলা একটা ড্রাম। ওসব ক্লাবেই আছে।

পটলা মাথা নাড়ে—গুড্! আর তাঁবু ষ্টেজ্-এর খর্চা টিকিট বিক্রী থেকেই এসে যাবে, তাছাড়াও লাভ থাকবে। ব—ব্যবসা বুঝিস?

ওটা আমাদের চেয়ে পটলা বেশী বোঝে। ওর বাবা-কাকারা এখানের বড় ব্যবসায়ী; আড়ত, তেলকল, করাতকল বড় দোকান সব আছে। পটলা বলে—নবমী ডেকরেটার এর নটবরবাবুকে বলেছি। দু-দুশো টাকা এ্যাডভান্স দিলে তাঁবু-ষ্টেজ সব বানিয়ে দেবে।

হোঁৎকা আশাভরে বলে—তয় ভাবনা নাই। দিনকার সেল হইতে ওগো ডেলি টাকা দিমু।

পটলা তখুনিই কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ে। আমরাও দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠেছি। পটলার অঙ্কে মাথা খুব সাফ। সে দুপাতায় হিসাব করে দেখায় ডেলি দুটো শো-তে কম করে আড়াই শো টাকা ধরে পাঁচশো তো হবেই। ছুটির দিন ম্যাটিনিতেও শ'খানেক। সেটা ফালতু রোজকার। ডেলি চারশো করে হলেও দশ দিন মেলা থাকে। নিদেন চার হাজার বিক্রী হবেই। তাঁবু ষ্টেজ ভাড়া হাজার টাকা, পাবলিসিটি পাঁচশো, ইলেকট্রিক দুশো—টিফিন ক'জনের তিনশো। সাকুল্যে দুহাজার খর্চা, আর পাচ্ছি চার হাজার। পটলা থার্ড স্যারের মত প্রশ্ন করে।

—ত-তাহলে ল-লাভ?

আমরা জানাই—দু হাজার।

দু হাজার টাকা পঞ্চ পাণ্ডবের হাতে এলে এবারে হেমন্তদাকে

এনেই প্রোগ্রাম করানো হবে, নিদেন সেল হবে দশ হাজার টাকা। পটলা বলে,—দিস্ ইজ বিজনেস। দু হাজার থেকে—দ-দশ হাজার। লাভ আট হাজার।

মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হোঁৎকা বেদম গ্যাস খেয়ে বলে, নাইনা পড়। পোষ্টার দিমু—পটলা দি ম্যাজিসিয়ান।

আমি এর মধ্যে ডজন খানেক কবিতা লিখেছি। স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা ছাপা হয়েছে। তারই জোরে জানাই—ওটা না। পটলকুমারের ইন্দ্রজাল—এই হবে ব্যানার।

ভোটে ওই নামই গৃহীত হল।

পটলা বলে—দিদিমাকে হ-হাতিয়েছি। তিন্-শো টাকা ম-ম্যানেজড।

সুতরাং কাজে নামতে আর বাধা নেই। পটলার দিদিমার জয়জয়কার হোক। নাতি তার পি-সি সরকার হবেই এবার। গোকুল প্রেসে হ্যাণ্ডবিল ছাপা হচ্ছে, গোবরার মামা কোন সিনেমাহলের ম্যানেজার। তাদের চেনা প্রেসে তিনশো লাল নীল পোষ্টারও ছাপা হয়ে গেছে। পটলকুমারের পাগড়ীতে পালক গোঁজা ছবি সমেত (অবশ্য ছবিতে পটলাকে চেনা যাচ্ছে না);

ডেকরেটার কোম্পানীর নসুবাবু বলে।

—পাঁচশো টাকা আগাম দিতে হবে।

আমাদের বাজেট বর্তমানে দুশো টাকা, তার বেশী দেবার সাধ্য নেই। কিন্তু নসুবাবুও রাজী হবেনা। বলে—অর্দ্ধেক দিতে হবে।

তীরে এসে তরী ডোবে আর কি? ওদিকে রাসতলায় মেলার কাজ সুরু হয়েছে। বিরাট উঁচু বিজলি নাগরদোলা, হাত পা হীন মাষ্টার জগুর অত্যাশ্চর্য খেলার পোষ্টার পড়েছে, তাঁবুর বাঁশ খুটি এসে গেছে, দোকান পশার বসছে। আমাদের জায়গায় শুধু চ্যাঠাই এ পোষ্টার ঝুলছে। পটল কুমারের ইন্দ্রজালের। যেন দড়িতে ওই পটলকুমারকে আমরা লটকে দিয়েছি।



হোঁৎকা বলে—নসুবাবু একখান শয়তান—ডেভিল। শেষ অবধি আর দুশো টাকা ম্যানেজ করা হ'ল। আখতার খাঁ কাবুলিওয়ালার পাড়াতে অনেক দিনের ব্যবসা। মাঝে মাঝে দুপুরের রোদে টাকার তাগাদায়' এলে গরম লাগলে ক্লাবে এসে জিরোয়। জলটল খায়। সেই সূত্রেই আমাদের সঙ্গে পরিচয়। এহেন আখতার খাঁ আমাদের সেদিন চুপচাপ বসে থাকতে দেখে শুধোয়—কি হোয়েসে বাবা লোগ্‌রা। হোৎকা বাবু?

হাতের মুঠো থেকে নিদেন আট হাজার টাকা বের হয়ে যাবে মাত্র দুশো টাকার জন্যে, এই খবর শুনে লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার আখতার খাঁ এর কঠিন বুকটা নরম হয়। বলে সে—তিক্ হ্যায় হোঁৎকাবাবু শোচো মৎ, হম্ দেগা।

অবাক হই আমরা—তুমি দুশো টাকা দেবে খাঁ সাহেব? আখতার খাঁ তামাটে দাড়ি নেড়ে বলে-হ্যাঁ! লেকিন ছুদ্ দিতে হোবে। দুশো রূপেয়া দিবে, তুম্ হোঁৎকাবাবু এক মাহিনার অন্তর দোশো রূপেয়া আসল আর চল্লিশ রূপেয়া ছুদ, দোশো চালিশ রূপেয়া হামাকে দিবে।

আমাদের কাগজে কলমে ইন্দ্রজাল থেকে নিট লাভ দুহাজার টাকা। ফ্যাংশন করলে তো ক্লিন আটহাজার, সেটা না করলে ও দুহাজার থাকছেই। পটলার হিসাব খুবই সাফ। তাই হোঁৎকা, গোবরা সমস্বরে বলে—তাই পাবে খাঁ সাহেব। কিন্তু টাকার আজই যে দরকার।

—হোবে! খাঁ সাহেব ওয়াসকিট-এর পকেট থেকে রসিদবই বের করে বলে হোঁৎকাকে—দস্তখৎ করো। লেকিন ছুদ মে আগারি কাট লেতা হ্যায়, স্রিফ তুম্‌কো বারে পিছু লেগা।

হোঁৎকা ইংরাজীতে বেশ পাকাপোক্ত ভাবে সই করে, গোবর্দ্ধন হ'ল তার জামিনদার। ওর বাবার বাজারে সোনা রূপার দোকান

আছে। খাঁ সাহেব তার ভিতরের পকেট থেকে দোমড়ানো দুখানা একশো টাকার নোট দিয়ে দেয়।

এরপর ঝড় বয়ে যায় পঞ্চপাণ্ডবের ক্লাবের দরমাঘেরা আস্তানায়। পটলা গিয়ে ডেকরেটারকে চারশো টাকা আগাম দিয়ে কাজ সুরু করিয়েছে। গোবর্দ্ধন নিজে দাঁড়িয়ে থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধায়, সে ওই কাজে লেগেছে। পটলার সময় নেই।

হেঁৎকা আমি এর মধ্যে লাল শালুর উপর লম্বা টুপি, ছক্কর বক্কর প্যাণ্ট পরা ছবি—কোনটা বাক্সবন্দী অবস্থায় মুক্তির সংগ্রাম, করাত দিয়ে মানুষ আধখানা করার বিপর্যয় কাণ্ডের ছবি সেটে ব্যানার করেছি। আর পাড়ার ভূতো, ন্যাপলা—গোবিন্দের দল স্রেফ ভাঁড়ের চা আর লেড়ো বিস্কুট চুষে সারা এলাকার বাড়ির থাম, বটগাছ রেললাইনের গা— ভরিয়ে দিয়েছে পটলকুমারের পোষ্টারে।

পটলা ও খুব ব্যস্ত। নোতুন খেলার মহড়া দিচ্ছে, হেঁৎকাকে সহকারী করে নিয়েছে। হেঁৎকা ওদের পাড়ার বুড়ো ভবেশ উকিলকে ম্যানেজ করে তার একটা ঢলঢলে কালো প্যাণ্ট আর কোট বাগিয়ে রীতিমত কাগজ খেয়ে কাগজের নল বের করার খেলাটা শিখে নিয়েছে। তারপরই পটল কুমারের সঙ্গে ষ্টেজে খেলা দেখাবে।

ফটিক তার চ্যালাদের নিয়ে বাঁশী—বেহালা আর ড্রামে গুরু গুরু শব্দ তুলে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক এর মহলা দিচ্ছে। ক্লাবের থিয়েটারে লাইট দেয় পঞ্চা, সেও এসে হাজির হয়েছে একান্ন টাকা এ্যাডভ্যান্স নিয়ে দু-তিনটি ফোকাসের মুখে লাল নীল বেগুনি কাগজ লাগিয়ে আলো ফেলছে।

আমি আর গোবরা এদিক সামলাচ্ছি। কাউণ্টারেও বসতে হবে। হেঁৎকা বলে—তরাই দেখ। নগদ পয়সা হুঁসিয়ার ; থাকবি গোবরার হাতে ক্যাস।

সে বলে—ক্যাসে কিন্তু আর আশি নয়া পয়সা আছে। ইন্দ্রজাল বিশারদ পঠলা বলে—তোরা কাওয়ার্ড। দেখবি আজ থেকেই পয়সা ছপ্পর ফুঁড়ে আসবে।



মেলা জমে উঠেছে এবার জোর। মাঠ—মন্দিরের চত্বর—রাসতলা, দিঘীর ধার ছাড়িয়ে চলে বড় রাস্তা অবধি। আমাদের পটলকুমারের ইন্দ্রজালের তাঁবুটা পড়েছে সামনেই। লাল নীল ব্যানার-এ ওই সব বহু বিচিত্র খেলার ছবি, মাঝখানে পটলার রাজা বাদশার মত উফীষপরা ছবি দারুন মানিয়েছে। পটলকুমার-এর অন্তর্ধান, 'ভ্যানিসিং-পটল' নাকি দারুন খেলা!

এর মধ্যে ফটিক কর্তাল হারমোনিয়াম-বাঁশী-বেহালা নিয়ে মাইকের সামনে সুরলহরী তুলছে। মাঝে মাঝে হেঁৎকা হেঁড়ে গলায় ঘোষনা করছে—মিশর এর পিরামিড থেকে যাদুবিদ্যা শিখে পটলকুমার আজ প্রথম অভিবাদন জানাইত্যাছেন দর্শকগো। আহেন—চক্ষু সার্থক করেন। পৃথিবীর নবম আশ্চর্য ত্যাখেন—শ্রীপটলকুমার-এর ইন্দ্ররজাল। ফটিক এর পরই দুরু দুরু শব্দে ড্রাম বাজিয়ে চলেছে।

পটলকুমার এখন বেশ চালু হয়ে উঠেছে। ষ্টেজে পঞ্চা, ফোকাস ফিট করেছে, ফটিকও যন্ত্রপাতি নিয়ে বসেছে। হেঁৎকা ভূপেন উকিলের দুসাইজ বড় প্যাণ্ট আর ঢলঢলে কোট সঙ্গে কালো টাই বেঁধে পাকা সহকারী হয়ে গেছে।

লোকজন ঢুকছে তাঁবুতে। চেয়ার পিছনে—সামনে তেরপল পেতে লোয়ার ক্লাশ। গোবর্দ্ধন ফটাফট্ টিকিট কাটছে, পয়সা নিচ্ছে। ওদিকে বসেছে ন্যাপলা। হেঁৎকা একফাঁকে এসে দেখে যায়।

বলসে—বিক্রী বাটা ক্যামন রে?

জানাই—লোয়ার ক্লাশ ফুল, আপার ক্লাশ ও ফুল হয়ে যাবে।

হেঁৎকা বলে—ভেরিগুড। তালি তিন শো ট্যাকা হইব।

ওদিকে পাটকলের মজুর-রা ঢুকছে দল বেঁধে, কুলেপাড়ার রতে, নীলু—পিকুদের দলকে ও দেখলাম টিকিট কেটেছে। ওরা পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের শত্রু, আমাদের ফ্যাংশানে এসে পিক্ দেয়, গোলমাল করে। থিয়েটারে আওয়াজ দেয়। সেতো বিনাপয়সাতেই করে কিছুটা রেখে ঢেকে। এখন পয়সা দিয়ে ঢুকছে। কি হবে কে জানে। বলি

হোঁৎকাকে—পটলা সব ম্যাজিক ট্যাজিক ঠিক ঠিক দেখাতে পারবে তো রে।

হোঁৎকাও এখন পটলকুমারের এক নম্বর চ্যালা। সেও নাকি এই ম্যাজিকের দলকে আরও বড় করবে। দেশবিদেশে ঘুরবে। তাছাড়া পয়লা শোতেই হাউস ফুল হতে দেখে হোঁৎকার সাহস বেড়ে গেছে। বলে সে—পারবে না মানে? ওর নাম দেখস্ ফাইটা পড়বো ফাষ্ট শোর পরই। দশদিনে হক্কল শো হাউস ফুল টানবো। আর 'ভ্যানিসিং পটলা' আইটেম খান্ যা করছে—হক্কলই ভ্যানিস্ হইব। টিকিট বেইচ্যা যা, দরকার হয় বিশপচিশখান্ এক্‌ষ্ট্রা সিট দিয়া দিবি। কামাইয়া ল—

ঝিনি ঝিনি সুরে ফটিক কোম্পানীর আবহ সঙ্গীত বাজছে। হাউস ফুল। একষ্ট্রা সিটও পড়েছে। এখনকার মত টিকিট বিক্রী বন্ধ। কাউন্টারের ফোকরের সামনে দু'এক রাউণ্ড লড়াইও হয়ে গেছে মিশরের পিরামিড-এর মধ্যে শিখে আসা ম্যাজিক দেখার জন্য। লাইন পড়বে একটু পর থেকেই।

তাঁবুতে তখন পঞ্চার লাল নীল বেগুনি আলোর কেরামতি আর ফটিকের ঝিনিঝিনি বাদ্য বাজছে। আলোটা নিভে এসেছে—তারপরই দপ করে লাল আলো জ্বলে ওঠে। মঞ্চে দেখা যায় রাজপুত্রের মত জরির ভাড়া করা যাত্রার দলের পোষাক পরা পটলকুমারকে, মাথায় তাজ—গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা, হাতে কালো ছোটো একটা লাঠি। চড় চড় শব্দে হাততালি পড়ে। পটলা মাথা নুইয়ে দর্শকদের অভিনন্দন জানায়।

তার প্রথম খেলা 'ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া'—দিদিমার একটা পুরানো কুমণ্ডুল। তার মধ্যে থেকে জলটা ফেলে দিয়ে ওপাশের একটা ঢাকা ষ্ট্যাণ্ড এর মধ্যে রেখেছে কুমণ্ডুলুটাকে। পটলকুমার মাথা খাটিয়ে সাইফন্ যোগে নীচে দিয়ে নল এনে কমণ্ডুলুর মধ্যে সেই পাইপ রেখেছে যাতে জল জমতে পারে সবসময়।



তারপর ওর বাক্স থেকে রুমাল শাঁখআলু বের করার খেলা। হোঁৎকাও গালে রং মেখে কালো প্যাণ্ট কোট টাই পরে সাহেব সেজে সেই বাক্স এগিয়ে দিচ্ছে, পটলকুমার ইল্লিগিল্লি পো—বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে ফড় ফড় করে রঙ্গীন রুমাল বের করছে, দুচারটে শাঁখআলু বের করে ছুঁড়ে দিচ্ছে দর্শকদের মধ্যে। চড় চড় হাততালি পড়ে। খেলা জমে উঠেছে। এরপরই খোল থেকে বের করে খরগোস!

তারপরই ঘটনাটা ঘটে যায়, হোঁৎকা চীৎকার করে ওঠে দেশজ ভাষায়—ধর। ধর হালায় পটলা!

তার আগেই পায়রা দুটো স্যাৎ করে বাক্সোয় পোরার আগেই উড়ে যায়, ডানা বাঁধা হয় নি ঠিকমত। এবার পায়রা বের করে তাক লাগাবার কথা। তার আগে পায়রাই উড়ে গেছে।

দর্শকরা হৈ চৈ করছে, তাঁবুর ভিতর হকচকিয়ে গিয়ে পায়রা দুটো বনবনিয়ে উড়ছে। সিটি বাজছে তারস্বরে। কে চীৎকার করে।

—এইবার ঘুঘু চরাবি পটলা!

ফুলেপাড়ার পিতু তিনু মস্তানের দল আওয়াজ দিচ্ছে আর পায়রা দুটো ঘুরে ঘুরে উড়ছে। সারা তাঁবুর দর্শকরা পায়রা ওড়ানোই দেখছে সিটি বাজিয়ে।

শেষ অবধি কানাতের ফাঁক পেয়ে ওরা উড়ে বের হয়ে গেল আকাশে। পটলকুমার ঘামছে—হোঁৎকাকে যেন খুন করেই ফেলবে। তবু ভরাটি গলায় পটলকুমার যাদুকাঠি নেড়ে হাঁক দেয়—ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া।

কমণ্ডুলুটা তুলেই চমকে ওঠে। তাড়াতাড়িতে দিদিমার বাতিল ফুটো কমণ্ডুলুটা নিয়ে এসেছে, পাইপের জল যা এসেছে ফুটো দিয়ে সোজা চৌকির নীচে পড়ে গেছে। কমণ্ডুলু শূন্য।

কে চীৎকার করে—ওয়াটার কইরে।

অন্যজন আওয়াজ দেয়—খরায় সব ওয়াটার শুখিয়ে গেছে।

একজন গর্জন করে ওঠে—পহা দিয়ে ম্যাজিক দেখতে ঢুকেছি, পেঁদিয়ে মেক্ ওয়াটার করিয়ে দেব।

চমকে উঠি। হৈচৈ দানা বাঁধছে। এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিল ন্যাপলা। ইন্টারভ্যালে দু'একটা নাচএর ব্যবস্থাও রেখেছিল পটলকুমার। ন্যাপলা সাপুড়ে সেজে ফটিকের ঝমাঝম্ বাজনার তালে নাচতে নাচতে এসেছে। ন্যাপলা যাত্রার দলে নাচে, বেশ জমিয়ে দেয়। উত্তেজিত দর্শকদল তবু কিছুটা চুপ করে, তখন ন্যাপলার উপর লাল, নীল, বেগুনী আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে লাইটম্যান।

ভিতরে গিয়ে দেখি পটলা আর হোঁৎকায় হাতাহাতি হবার যোগাড়। হোঁৎকা গর্জাচ্ছে—ফুটো কমণ্ডুলু আনছস—পায়রাটারে বাঁধলাম, খুলছে কোন হালায়? তর ফুটানির বাজী দেখামু না—

ওকে থামাই—চুপ কর হোঁৎকা। ম্যানেজ হয়ে গেছে। এখন ভালো করে বাকী খেলা দেখা। দারুণ হবে কিন্তু।

এরপর পটলকুমারের মানুষ দ্বিখণ্ডীকরণ খেলা, দুচারটে ছোট আইটেমের পর এই খেলা দেখায়, তারপর প্রধান এবং শেষ খেলা ভ্যানিশিং পটলা।

ওদিকে পরের শোর টিকিট বিক্রী সুরু হয়েছে। ফুটো কমণ্ডুলুটাকে বদলে এনেছে গিরিধারী, সতুদের দুটো নোতুন পায়রাও এসে গেছে আবার। এবার আর ভুল হবে না।

ইনটারভ্যালের পর দুতিনটে খেলা বেশ নির্বিবাদেই হয়ে গেল। এরপর সেই মানুষ কাটার খেলা।

উত্তেজিত দর্শকদের অনেকে শান্ত হয়েছে, টেবিলে শুয়েছে নামো রস্তির রমু। তাকে দশটাকা দিতে হবে। তার কাজের মধ্যে শুয়ে চাদর চাপা দেবে, তারপরই টেবিলের ডালা খুলে নীচে চলে যাবে, করাতটা চালু হবার আগেই। আবার করাত বন্ধ হলে উপরে আসবে। করাত তাকে যাদু বলে কাটতে পারেনি।

রমু বলে—ভালো বিক্রি হয়েছে পঁচিশ টাকা দিতে হবে।



হোঁৎকা গর্জে ওঠে—ক্যান দিমু। দশ দিচ্ছি—বেশী চাইলে একেবারে করাত দিই ফাড়ি দিব হালায়।

রমুর ভয় হয়। টেবিলে শুইয়েছে তাকে, উপরে ধারালো কাঠকলের করাত, চক চক করছে। পটলকুমার লেকচার দিচ্ছে —রানিং স্। মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেব আমাদের সামনে—

হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে রমু, বিকট শব্দে চীৎকার করছে। হোঁৎকাও টিপে ধরেছে তাকে। রমু চীৎকার করে—বাঁচাও। আমাকে এরা সত্যি সত্যি কেটে ফেলরে—বাঁচাও ওরে বাবা—

বিকট চীৎকার আর ধস্তাধস্তিতে এবার কুলেপাড়ার পিনু-তিনু-পাটকলের মজুরের দল লাফ দিয়ে ওঠে। পায়রা উড়ে গেছে—জলও আনতে পারেনি—হোঁৎকা একবার চিৎপাত হয়ে পড়ে খেলা মাটি করেছে, তার উপর ওই খুন খারাপির ব্যাপারে এবার বেশ কয়েকজন লাফ দিয়ে উঠেছে ষ্টেজে। নসুবাবু ডেকরেটার ষ্টেজ তেমন যুৎসই করেনি। ওদের লাফানিতে সবশুদ্ধ মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়েছে।

তারপরই শুরু হয়ে যায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কে চীৎকার করে। —ধর ব্যাটাদের। পটলকুমারের পটল তুলে দে।

কে খপ্ করে ধরেছে হোঁৎকাকেই, বেকায়দায় ভাঙ্গা ষ্টেজের উপর পড়ে আছে হোঁৎকা, ধরে ফেলছে তাকে, ঢলঢলে প্যাণ্টটাই রয়ে গেল তার হাতে। হোঁৎকা প্যাণ্ট ফেলে আণ্ডারউয়ার পরে সটকেছে, পটলাকে ওরা ধরেছে। ওর রাজপুত্রের ভাড়া করা জরির পোষাক ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে, কপালটা কার ঘুঁসিতে ফুলে গেছে। ফটিক তার আগেই হারমোনিয়াম—ড্রাম—নিয়ে দৌড়েছে।

গোবর্দ্ধন হিসাবী ছেলে; তাঁবুর মধ্যের সংগ্রাম তখন বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফড় ফড় করে ফাঁড়ছে তাঁবু, কানাত। কে পট করে খুটিই তুলেছে। চারিদিকে কলরব আর্তনাদ। দর্শকরা দৌড়াদৌড়ি করে বের হবার চেষ্টা করতে সারা তাঁবুই ফেড়ে ফেলেছে,

বাঁশের খুঁটিগুলোয় চাপ পড়তে দু চারটে তাঁবুর ছাউনির তেরপল নিয়েই পড়ে যায়।

গোবরা সুটকেশের ক্যাস নিয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে বলে।—ফুটে যা সমী।

তবু বলি—পটলা, হোঁৎকা ওরা কোথায়?

গোবরা বলে—সব ভ্যানিশ্ হয়ে গেছে। এই বেলা কেটে পড়। ধরতে পারলে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দেবে।

তখন দর্শকরা টিকিটের পয়সা উসুল করার জন্য বাঁশখুঁটি-চেয়ার —কেউ পটলার ওয়াটার অব ইণ্ডিয়ার ফুটো কমণ্ডুলু—কে হোঁৎকার পরনের ভূপেন উকিলের ঢলঢলে প্যাণ্টটা হাতিয়ে বেরুচ্ছে, তাঁবু ভেঙ্গে পড়েছে, কে সুন্দর লাল শালুর ব্যানারটাই টেনে পাগড়ী করে নিয়ে গেল, যেন লুটপাঠ সুরু হয়েছে।

ততক্ষণে পটলা হাওয়া কেটেছে, হোঁৎকাও বেপাত্তা। শেষ অবধি পুলিশ এসে পড়ে। আমরা সকলেই তখন 'ভ্যানিশ' হয়ে গেছি।

এরপর কদিন ধরেই গা ঢাকা দিয়ে ফিরছি আমরা। আখতার খাঁ সাহেব জোব্বা লাঠি নিয়ে ক্লাবঘরের দরজায় দম্মাদম বাড়ি মেরে হুঙ্কার তোলে।

—হোঁৎকা কাঁহা বাগ্লো, মেরা রূপেয়া, ছুদ—সবকুচু উশুল কর লেগা যব্ পাকড়ে গা।

নকুলের দোকান, লেকের ধার—ক্লাবের মাঠ তন্নতন্ন করে খুঁজছে খাঁ সাহেব। ওদিকে ডেকরেটার নসুবাবুও ঘুরছে আমাদের সন্ধানে বিরাট এক লিষ্টি হাতে নিয়ে।

তার তেরপল—বাঁশ—চেয়ার—তক্তা-যা হারিয়েছে, তাও কম নয়। কুল্যে হাজার দুয়েক টাকা তো হবেই।

বাধ্য হয়েই রাসমেলা ছেড়ে পটলার মামার বাড়ির অজপাড়াগাঁয়ে এসেছি। হোঁৎকা গর্জায়—তর হিসাব পুরোপুরি ভুল আছিল



পটলা। দুহাজার টাকা লাভ হইব? তারপর অষ্ট হাজার টাকা। এহন অষ্টরম্ভা দেহি চক্ষে। উঃ ফেরবার ও পথ নাই রে। ইন্দ্রজাল যা দেখাইলি, হক্কলেরে ভ্যানিশ্ কইরা ছাড়লি।

আপাততঃ অজ্ঞাতবাসে রয়েছি, কবে স্বস্থানে ফিরবো জানিনা। পটলার জন্যে আর কত দুর্ভোগ সইতে হবে কে জানে।

——

www.arisumu.com

www.arisumu.com

## পটলার অগ্নিপরীক্ষা

টেষ্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বের হতে দেখি আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মেম্বারদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কাঁপ ছটকানো ঘুড়ির মতই।

চাঁদিয়াল—একতো, লক্কা ঘুড়িগুলো যখন আকাশে ওড়ে তখন দেখতে দারুণ লাগে, আর মুক্ত উদার নীল আকাশে তারা খুশিতে ফরফর করে ওঠা নামা করে, হেলে দুলে যেন আকাশে রাজত্বি করে।

আর যখন এক একটা উড়ন্ত ঘুড়িকে কেটে নীল আকাশে ভাসিয়ে দেয় তখন তাদের মেজাজই আলাদা, বাজপাখীর মত রাজকীয় ভাব ফুটে ওঠে ওদের উড়ক্কু মেজাজে।



আমরা পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের সভ্যরাও কিছুটা তেমনি মেজাজ নিয়েই কুলেপাড়ার মধ্যগগণে বিরাজ করছিলাম।

আজ কালচারাল ফ্যাংশান, কাল এ পূজো, সে পূজো, ফুটবল মরশুমে তো আমাদের অবস্থা এই অঞ্চলে খুদে 'পেলে'র মতই। কেউ পেলে, কেউ গারিঞ্চা, কেউ ইউসিবিয়ো ইত্যাদি। পাড়ার সকলেই চিনতো, আর পটলার দৌলতে অনিল কেবিনের 'ডিম'-এর বংশনাশ করতাম। তারপর খরাত্রাণ, বন্যাত্রাণ এসব ত্রাণ টান এর কার্যেও আমরাই ছিলাম অগ্রণী।

সেবার কদিনের বর্ষায় কুলে পাড়ার নামো বস্তি, তিন নম্বর বস্তি ডুবুডুবু হয়েছিল জমা জলে, খাটাপায়খানার গামলাগুলো বের হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে, ঘরেও জল ঢুকছে অনেকের। এ হেন আপদকালে আমাদের সেক্রেটারী হোঁৎকাই এগিয়ে এল আমাদের নিয়ে।

আমরাই ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে তাবত ইস্কুল ঘরে, মায় পটলাদের একটা গুদামে আশ্রয় দিয়েছিলাম। কাগজেও আমাদের উদ্ধার কার্যের ছবি বের করে দিয়েছিল এ পাড়ার ভটুক দা। ও কোন কাগজের অনাহারী ( সঠিক কথাটা নাকি অনারারী ) সংবাদদাতা। আমরা ওই পরিচয়েই জানতাম ওকে। তিনিই কাগজে খবরটা প্রকাশ করেছিলেন।

সব মিলিয়ে আমরা ছিলাম কুলেপাড়ার মুক্তাকাশে বিচরণশীল চাঁদিয়াল ঘুড়ির মতই স্বাধীন্।

কিন্তু এত দিয়েও স্কুলের ইংরিজিস্যার নবনীবাবু, অঙ্কের গোবিন্দ স্যার মায় সংস্কৃতের হেডপণ্ডিত ভবানী স্যারকেও কায়দা করতে পারলাম না। হোঁৎকা আবার বাংলাতেও ফেল করেছে। গুপীস্যার তো বলেন—তুই বঙ্গ সন্তান না কি রে ?

অর্থাৎ জন্মবৃত্তান্ত তুলেও শুনতে হয়েছে।

হোঁৎকা কুল্যে চার বিষয়ে, পটলা ইংরাজীতে, ফটিক কুল্যে তিন

সাবজেক্টে লটকেছে। আমিই কোন রকমে বেদাগ অবস্থায় বের হয়েছি।

হোঁৎকা কটাই কর্মকারের দোকানে হাপরের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তহনই কইছিলাম আমার হইব না। কাকার কারখানাতেই কাম করুম। তরা শুনলি না। কইলি পড়। পইড়া কিছু হইব না। কর্মই ধর্ম।

হোঁৎকা মাঝে মাঝে দার্শনিক হয়ে ওঠে, তখন অমনি বেশ দামী দামী কথা বলে। ফটিক এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। ক্লাবে সন্ধ্যার পর যেন শোকসভা বসেছে ওদের। কেবল ফুলমালা ধূপটুপই নেই। নাহলে তেমনি শোকস্তব্ধ পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

ফটিক বলে—ইস্কুলে পড়া টড়ার চেয়ে সঙ্গীত বিদ্যাই বড় রে। ভাবছি মন প্রাণ দিয়ে এবার সঙ্গীত সেবাই করবো।

হোঁৎকা বলে—কচু-হইবো এতে! এ্যাদ্দিন তো বমিই করছিলি, কি হইছে?

ফটিক আর্তনাদ করে ওঠে।

—ফুট কাটবি না হোঁৎকা, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দোব। সুইসাইড করবো।

আমি ঘাবড়ে যাই! ওদের মধ্যে আমিই ভালোভাবে পাশ করে ওদের কাছে দোষী হয়েছি। তাই চুপ করেই ছিলাম। এবার রক্তটক্তর কথা, সুইসাইডের কথা শুনে ঘাবড়ে যাই। বলি,—আবার ওসব কেন, এখনও সময় আছে। পড়াশোনা কর।

আমার উপদেশ ওদের আশ্বস্ত করতে পারে না। হঠাৎ গোবরাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে চাইলাম। ওর বাহন একটা ধ্যাড়ধেড়ে সাইকেল। ওটা নাকি ও উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছে।

ইতিপূর্বে ওর বাবা সেদিনে ওটায় চড়ে সারা কলকাতা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব চব্বিশ পরগণার তাবৎ মেছো ভেড়ি পরিভ্রমণ করতো তার বয়স হতে তস্য ভ্রাতা ওটায় চড়ে বারাসত অবধি তাগাদায় বের হতো,



তিনি গত হতে তাঁর কোন যোগ্য ওয়ারিশান না থাকায় ওটা গোবরার দখলে এসেছে।

ততদিনে স্রেফ ফ্রেমখানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাকীটা গোবরা লাগিয়ে এখন চালু করেছে। ওতে সে তাবৎ বেলেঘাটা কুলেপাড়া চষে বেড়ায়। অবশ্য ব্রেকগুলো আর লাগিয়ে বাজে খর্চা করেনি, ওর কাজ ঠ্যাং দিয়েই করে থাকে। আর বেলটেল লাগাবার দরকারও বোধ করেনি।

কারণ সাইকেলটা চললে যে রকম ঢং ঢাং কড় কড় শব্দ ওঠে ওতেই বেলের কাজ হয়ে যায়। লোকজন আগেই ওর সাইকেলের শব্দ পেয়ে যায়।

গোবরা এযেন সাইকেলে চড়েই একটা পা দাওয়ায় ঠেকিয়ে গতিবেগ সামলে বলে।

—সব্বোনাশ হয়ে গেছে র‍্যা।

হোঁৎকা উদাস নয়নে চাইল ওর দিকে। এর চেয়ে আর কি সর্বনাশ হাতে পারে জানা ছিল না। ফটিক বলে।

—আর হতে কি বাকী আছে বল? বাবা তো চুলের মুঠি ধরে গর্জাচ্ছেন খুন করেঙ্গা। তাই ভাবছি অন্যের হাতে এ জীবন বিকিয়ে দেবার আগে নিজের হাতেই এটাকে শেষ করবো। উঃ—

গোবরা বলে—তাই করতে হবে এবার। ওদিকে ইস্কুলে তো ধেড়িয়েছিস, এবার কেলাবও তুলে দিতে হবে। কি নিয়ে থাকবি?

চাইলাম ওর দিকে। গোবরা তখন ও ওর কথা শেষ করার চেষ্টা না করেই মোক্ষম ঘাটা দেয়। বলে সে।

—পটলাকে ওর কাকাবাবু ওর রাঙ্গা পিসেমশাই না কে এক জাঁদরেল হেডমাষ্টার আছেন কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে সেখানেই চালান করছে। তিনমাস ওখানে তাঁর হেপাজতে রেখে একেবারে ফাইন্যালের মুখে আনবে।

চমকে উঠি সকলেই। পটলা আমাদের মধ্যমণি, কামধেনু,

প্রতিপালক। ওদের অবস্থাও ভালো। ওর ঠাকুমার বিরাট সম্পত্তি, কারখানার ওই ভবিষ্যৎ ওয়ারিশান। ওর টাকাতেই ক্লাবের এত নামডাক, আমাদের এত গুডউইল অর্থাৎ সুনাম টুনাম। অনিল কেবিনের টোষ্ট ওমলেটের বিল ও দেয়, গোকুলের কুলপিমালাই-এর দেনা ও শোধ করে, ভজুয়া ঝালমুড়িওয়ালা, এতোয়ারি ফুচকা-ওয়ালাদের দেনাও শোধ করে। ওদেরও অনেক বিল বাকী—

ক্লাবে ব্যাডমিন্টন পড়েছে, তার খর্চা আছে। সর্বোপরি পটলার এই নির্বাসনের কথায় চমকে উঠি আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সূর্যহারা দিন হতে পারে, কিন্তু পটলাহারা পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের কথা ভাবাই যায়না।

হোঁৎকা চমকে ওঠে—কি কইলি? পটলাতো শুধু ইংরাজীতে কম নাম্বার পাইছে। তয় ওরে তাড়াইবো ক্যান? কলকাতায় থাইকা ইংরাজীতে পাকা হইতে পারবো না পটলা, ওরে ওই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের অজগাঁয়ে যাইবার লাগবো ইংরাজী শিক্ষকের জন্যে?

ফটিক বলে—একে একে নিভিছে দেউটি!

স্বর্ণলঙ্কা ডুবিছে আঁধারে।

হোৎকা গর্জে ওঠে—নাটক ফাটক রাখ। এহন কি হইব ভাব। হালায় ওগোর ট্যাকা কে দেবে? তহন তো ওমলেট, কুলপি-ঝালমুড়ি ভরপেট খাইছস?

কাদের কথা ভেবে ফটিক বলে।

—ক্লাবে আমি রেজিগনেশন দেব। পদত্যাগ করবো—

হোঁৎকা ফুঁসে ওঠে।

—কইরা ছাখ? তর পদ দুইখানা খুইলা নিমু। টেংরি টুকরা কইরা দিমু।

হাতাহাতি বেধে যাবার উপক্রম। থামাই ওদের।—কি হচ্ছে তোদের! পটলার সঙ্গে কাল সকালেই দেখা করে ব্যাপারটা কি জানতে হবে।



হোঁৎকা বলে—তুই যা গিয়া। আমাগোর দেখলে ওর ছোটকাকা গুলি কইরা দিবে। তুই 'গুড বয়' তরে কিছু কইবনা। তুই ম্যানেজ কর।

পরদিন সকালে পটলাদের বাড়ি যেতে দেখি ওর ছোটকাকাই এগিয়ে আসেন। ওদের বাড়িটাও বিরাট। পেছনে বেশ খানিকটা বাগান মত, আগেকার আমলের বাড়ি। বাগান, পুকুরও রয়েছে। এদিকে তিনতলা বাড়িটায় ওরা থাকে।

দারোয়ান, মালী, চাকর বাকরের অভাব নেই। ওদিকে দুখানা গাড়ি ধোয়ামোছা হচ্ছে। সামনে বৈঠকখানা, ওপাশে পটলার ঘর।

পটলার ছোটকাকা ওদের কারখানা দেখাশোনা করেন। সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন তিনি।

ছোটকাও আমাকে চেনেন। বলেন।

—টেষ্টেতো সেকেণ্ড হয়েছো। না।

ঘাড় নাড়লাম। তিনি বলেন।

—ভালোভাবে পাশ করতে হবে। নাহলে মেডিক্যালতে-ইনজিনিয়ারিং এনট্রান্স কোন পরীক্ষাতেই বসতে পারবেনা।

পরক্ষণেই বসেন তিনি।

—পটলা ইংরাজীতে এত কাঁচা তা ভাবিনি। এখানে পড়াশোনা ঠিকমত হবেনা, তাই ওকে বাইরেই পাঠাচ্ছি। কিছুদিন নিরিবিলিতে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করুক। কি বলো?

আমাকেই যেন পরামর্শ চাইছেন। অগত্যা আমি জানাই।

—তা ভালোই হবে।

ছোটকা খুশি হয়ে বলেন—গুড! পটলা আজই চলে যাচ্ছে। দেখা করবে তো, ওর ঘরে যাও। ওকেও বুঝিয়ে বলো ও যেন শায়েস্তাগঞ্জে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করে।

জায়গাটার নামও জানা গেল। শায়েস্তাগঞ্জ? কিন্তু অবস্থান

জানা যায় না, আর ম্যাপেও বোধহয় ওসব জায়গার কোন নাম ধাম নেই।

পটলার ঘরে গিয়ে দেখি ওর বইপত্র সব বাক্সবন্দী হয়ে গেছে, সুটকেশে জামা কাপড়ও পোরা হয়েছে, পটলাই শুধু বাইরে রয়ে গেছে। উদাস বেদনার্ত চাহনিতে আমার দিকে চেয়ে বলে পটলা।

—আমারে শাস্তি দেবার জন্যে শ্-শ্ শায়েস্তা—গ।

পটলার ব্রেক ফেল করেছে। বিশেষ করে উত্তেজনার মুহূর্তে ওর জিবটা আলটাকরায় আটকে যায়, অনেক কষ্টে আবার সেটাকে মুক্ত করে বাকী কথাটা শেষ করতে হয় পটলাকে।

আজ নিদারুণ দুঃখে ওর ব্রেক ফেল করেছে। আমিই বলি সান্ত্বনার সুরে—তিন মাসতো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে রে শায়েস্তা-গঞ্জে।

পটলা বলে—রাঙ্গা পিসেমশাইকে চিনিস না। ড-ড-ডেঞ্জারাস হেডমাষ্টার।

হেডমাষ্টারদের কিছুটা চিনি। গুরুগম্ভীর টাইপের মুখ। হাসির ছিটে ফোঁটা নেই। বুলডগ মার্কা চেহারা। অমনি কোন লোকের সঙ্গে একদিন বাস করলেই ধাত ছেড়ে যাবে, পটলাকে তিন মাস কাটাতে হবে সেখানে। পটলাকে এরচেয়ে ওদের সুন্দরবনের কাঠের গোলাতে পাঠালেও ভালো করতো। ওখানে বাঘটাঘ আছে, কিন্তু ওর পিসেমশাইতো সিংহ বিশেষ।

পটলা হতাশ কণ্ঠে বলে—আর-বেঁচে ফিরে আসবো না রে। একটা শোকসভা করিস যদি কিছু হয়ে যায়।

আমার চোখও জলে ভরে আসে। শুধোই,—তোর ঠাকুমা মত দিল যেতে?

পটলা বলে—ওর মেয়ের কাছে যাচ্ছি—উনিতো এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। বুড়িও বিশ্বাসঘাতক কনস্পিরেটার নাম্বার ওয়ান। ষড়যন্ত্রকারী।



ছোটকাকার ডাকে চাইলাম। ছোটকাকা বলেন—চল পটলা। তোকে পৌঁছে দিয়ে আবার কাজে বেরুতে হবে। দশটায় ট্রেন, হরিপাল ষ্টেশনে লোক থাকবে, ওখান থেকে বাসে-টেম্পোতে গিয়ে মাইল খানেক হাটতে হবে নবীগঞ্জ থেকে। কাছেই শায়েস্তাগঞ্জ। সব বলা আছে, চল। ও ঠিক পৌঁছে যাবি।

পটলার বই এর পুটলি, সুটকেশ সব তুলে শেষ মেষ পটলাকে তুলে ছোটকা বের হয়ে গেলেন। পটলার বাবা-মা মায় ঠাকুমা অবধি এহেন করুণ দৃশ্যটা বেশ উৎসাহ ভরে দেখলেন।

আমি ছলছল চোখে পটলাকে বাঘ সিংহের রাজত্বে নির্বাসন দিয়ে বের হয়ে এলাম।

ক্লাবের জামতলায় হোঁৎকা—ফটিক—গোবরা আরও দু'একজন নতুন সভ্য বসে আছে হা পিত্যেশ করে। এরমধ্যে অনিল কেবিনের মালিক ও পটলার নির্বাসনের খবর পেয়ে তার বাকী টাকার জন্য এসে ধরেছে হোঁৎকাকেই। —তুমিই সেক্রেটারী, ক্লাবের টিফিনের টাকা তোমাকেই দিতে হবে।

হোঁৎকা বলে—আমি পদত্যাগ কইরছি। এখন প্রেসিডেন্টের কাছে যাও গিয়া।

অর্থাৎ পটলাকেই 'রেফার' করছে সে। অনিল বলে—ওসব বুঝিনা। তোমাকেই দিতে হবে। পরে আসবো।

ফুচকাওয়ালাও নোটিশ দিয়েছে। সাতরূপেয়া উধার হ্যায়। দেনে পাড়গী।

ওরা ছটফট করছো এমন সময় আমাকে আসতে দেখে ওরা লাফ দিয়ে এসে একযোগে শুধোয়।

—কিছু হইল? পটলারে আটকাইছিস?

ফটিক শুধোয়—থামরে তো র‍্যা?

জানাই-না। পটলাকে একটু আগেই ওর ছোটকা গাড়িতে তুলে পাচার করে দিল শায়েস্তাগঞ্জে।

অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে-এ্যাঁ! পটলা নাই?

বলি—পটলা আছে। তবে কদ্দিন বেঁচে থাকবে তা জানিনা রে! ও বলে গেল, যদি ত্যামন কিছু হয় ওর ফটোতে মালাটালা দিয়ে শোকসভা করবি।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—হকলের শোকসভাই করনের লাগবো। তার আগে ঝাঁপে লাঠি দেই কেলাব বন্ধ কইরা দে।

ফটিক করুণসুরে গেয়ে ওঠে—বাবুল মেরে নৈহার ছুটকে যায়।

হোঁৎকা বলে—চুপ মাইরা থাক্ ফট্‌কে। নয়তো তরে মার্ডার করুম।

পটলা হরিপাল ষ্টেশনে নামতে একটি ছেলে এগিয়ে আসে। লোকজন-যাত্রীরা বের হচ্ছে। বেলা তখন দুপুর, মন মেজাজ ভালো নেই পটলার।

ছেলেটি নৃত্য করতে করতে আসছে। একটা পা যেন ছোট। বলে সে পটলাকে—তুমিই সুভাষ চন্দ্র। না?

পটলার ওইটাই পোশাকী নাম। পটলা মাঝে মাঝে ওই নামও ভুলে যায়। আজও হকচকিয়ে চাইল ওর দিকে। ছেলেটি নৃত্যছন্দে একপায়ে ভর দিয়ে দেহটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে।

—কলকাতা থেকে আসছো শায়েস্তাগঞ্জে যাবে নৃসিংহবাবুর বাড়ি?

পটলার পিসেমশাই এর নাম ধামই ওসব। আর পটলারও এবার মনে পড়ে তার নামটা। বলে সে—হ্যাঁ!

ছেলেটি বলে—আমার নাম পরাণ, হেডস্যার আমাকে আর বোঁচাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কইরে—

বোঁচা ও এসে পড়ে। বেশ ভরাটি গড়ন—তবে নাকটা কে যেন ওর কিলিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে। তাই বোধহয় বোঁচা নামই হয়ে গেছে তার।

ওরা দুজনে ওর বই-এর পুঁটলি—সুটকেশ নিয়ে নেচে নেচে চলেছে বাস এর দিকে।



ষ্টেশনের বাইরেই একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাস না জনসমষ্টির একটা জমাট পুঞ্জ ঠিক বোঝা যায় না। ভিতরেও ঠাস বোঝাই; বাইরে বনেটে, সর্বাঙ্গে—পা দানিতে লোক ঝুলছে। আর কনডাকটার তখনও চীৎকার করছে।

খালি গাড়ি। নবীগঞ্জ কুসুমপুর তেড়েকোনা পচাখাল বোধহয় তারপর ও নরকপুরেও যাবে।

পটলা বলে—কোথায় উঠবো?

ততক্ষণে পরাণ সেই ঘোড়া নৃত্য ঘোড়া বিশারদ এক পায়েই তর-তরিয়ে ছাদে উঠে গেছে, সেখানে সুটকেশ জমা করে বলে।

—উঠে পড়ো। জায়গা রেখেছি। পটলা ইতিউতি করছে। বাসের ছাদে চড়ে ভ্রমণ ইতিপূর্বে সে করেনি, কিন্তু বোঁচা ততক্ষণে ওর পিছনে ঠেলে ওকে তুলে দিয়েছে গাড়ির মাথায়। নিজেও উঠেছে।

বোঁচা বলে—বাতা ধরে টাইট হয়ে বসে থাকো নড়ো না। এ বাস ছাড়লে আজ আর বাস নেই। কাল মিলবে। এতেই যেতে হবে।

পটলা চোখবুজে প্রাণপণে সেই লোহার ছোট্ট রেলিং ধরে বসে আছে। বাস চলেছে—আর রাস্তাও তেমনি। খানা খন্দে ভরা। বাসটা লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। মনে হয় এখুনি খাদে নেমে পড়বে।

পটলা ঘামছে, মনে হয় শায়েস্তাগঞ্জে আর এ জীবনে পৌঁছতে হবে না, তার আগেই সে ছিটকে পড়বে। হাড় গোড় চুর্ণ হয়ে শেষ হবে। অবশ্য হাড় গোড়-এর মধ্যে আলগা হয়ে গেছে প্রায়।

এক একটা ঝাঁকানি দেয় বাসও আর নড়বড় করছে দেহটা। ওদিকে কে ওয়াক্ তুলে বমি করছে। ছাদ থেকে তরল বমিটা নীচের যাত্রীদের গা জামা ভিজিয়ে পড়ছে। কলরব ওঠে।

কে কার কথা শোনে। বাস ছুটে চলেছে বিকট শব্দে।

পটলার মনে হয় এ জীবনে আর কোনদিন কলকাতা ফিরতে পারবে না! বিদায় কলকাতা, বিদায় কুলেপাড়া, বিদায় পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব।

এখন বোধহয় ওরা আমতলায় আড্ডা দিচ্ছে। আর পটলা চলেছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কোন দূরে।

কতক্ষণ চলেছে এভাবে জানেনা পটলা। দু একবার পথে বাস থেমেছে, যত না যাত্রা নেমেছে উঠেছে তার থেকে বেশী।

একটা ছোট গঞ্জমত জায়গায় বাস থামতে বোঁচা লাফিয়ে নেমে পড়ে পটলার সুটকেশ, বই-এর পুঁটুলি নামিয়ে বলে, নেমে এসো সুভাষ। নবীগঞ্জ এসে গেছি।

পটলা কোনমতে এর তার ঠেলায় ছাদ থেকে পাকা আমের মত পড়েছে, দাঁড়াবার সামর্থ নেই। হাঁটু দুটো যেন 'লুজ' হয়ে গেছে। ফলে ধপাস্ করে মাটিতেই পড়েছে।

বোঁচা বলে—প্রথম প্রথম এ লাইনের বাসে উঠলে এমন হয়। দু-এক বার যাতায়াত করলে 'সেট' হয়ে যাবে। পা হাত নাড়াও, দেখবে আবার লুজ হাড়গোড় 'ফিট' হয়ে যাবে।

পটলা কোনমতে উঠে দাঁড়ালো। হাতে পায়ের খিলটা এবার ঠিক হচ্ছে।

ল্যাংচা পরান বলে—মাইলটাক পথ রিক্সা করে গেলে হেডস্যার রেগে যাবে। হেঁটেই চলো। উনি আবার 'সেলফ্ হেলফ'টা বেশী পছন্দ করেন।

নাক বসা বোঁচা নাকি সুরে বলে—বাড়ির কাছে গে সুভাষ তোমার সুটকেশ পুঁটুলি তুমি নিজে বইবে। নাহলে উনি রেগে গিয়ে অনথ বাধাবেন। আমার নাকে সেবার কিল মেরে নাকই ফাটিয়ে দিলেন।

ল্যাংচা পরান বলে ক্লাশে ইংরিজি ট্রানশ্লেসন্ পারিনি, লাঠির ঘায়ে হাঁটুর মালাই চাকি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন—সিংহ স্যার।



পটলা চমকে ওঠে তার রাঙ্গা পিসেমশাই-এর এ হেন পরিচয় পেয়ে। এর পা ভেঙ্গেছে, ওর নাক ফাটিয়েছে, কার হাত ভেঙ্গেছে, কার কি করেছে। এবার পটলার কি হবে কে জানে।

পটলা মিনমিন করে বলে। তোমাদের দাগী করেছেন তাহলে?

বোঁচা বলে—দেখবে শায়েস্তাগঞ্জে কত ছেলের হাত পা মচকানো —কপাল ফাটা, সব ক্লাশের ফার্ষ্ট সেকেণ্ড বয়রাই দাগী। তা তুমি তো এবার ফাইনাল দেবে—না?

পটলা বলে—দেখি পরীক্ষা দেবার মত অবস্থা থাকে কিনা। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পাড়া গ্রামের মাইল যেন ফুরোতে চায় না। ধূ ধূ মাঠ। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। ক্ষিধে তেষ্টাও পেয়েছে। আর গা হাত পা তখনও টনটন করছে। পটলা শুধোয়—আর কতদূর? শায়েস্তাগঞ্জ পৌঁছতে পারবো তো?

বোঁচা বলে—ওই তো এসে গেছি। সামনেই।

সামনে দূর দিগন্তে একটা গ্রামের রেখা দেখা যায় মাত্র। ওরা চলেছে ধূলি ধূসর কাঁচা সড়ক ধরে।

কাছাকাছি আসতে বোঁচা—পরান ওদের হাত থেকে সুটকেশ বই, বই-এর পুটুলি যুগপৎ পটলার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বলে—

এবার সিধে চলে যাও। ওই যে স্কুল ওর লাগোয়া ওঁর বাড়ি। উনি আবার সেলফ্ হেলপ্ খুব পছন্দ করেন। তোমার সুটকেশ পুটুলি আমাদের হাতে দেখলে আবার নাক ফাটিয়ে দেবেন কিনা কে জানে। গো অন্।

পটলার কোমর যেন ভেঙ্গে পড়বে ওই পুস্তক ভর্তি সুটকেশের ভারে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। খিদেতে পেট জ্বলছে। চোখে যেন সরষের ফুল দেখছে ওই 'সেলফ হেলপ' এর ঠ্যালায়। এমন জানলে এখানে কদাপি ও আসতো না।

কিন্তু আর ফেরার পথ নেই। দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে চারদিকে।

স্কুলটা ওদিকে—কিছু বট আম পেয়ারা গাছও রয়েছে। পটলা ওই মোট পুঁটুলি নিয়ে টলতে টলতে মুটের মত আসছে।

হঠাৎ বিকট গর্জন শুনে চমকে ওঠে। যেন একটা বাঘ গজরাচ্ছে। গাঁক্—গাঁক্—গোঁ—গরর—

পটলা চমকে উঠেছে কে জানে বাঁশবনে বাঘই বের হয়েছে বোধহয়, কারণ এর আগে গুপীগায়েন বাঘা বায়েন ছবিতে এমনি বাঁশ বনে বাঘ দেখেছে সে।

গাঁ—গরর—

পটলা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—ওরে বাবারে।

মাথায় সুটকেশ বই পত্তর ছিটকে পড়েছে, পটলা বনবাদাড় ভেদ করে দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়েছে, কপালটা কেটে রক্ত ঝরছে, হঠাৎ কাকে ওদিকের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল। পিসীমা পটলের পথ চেয়েছিল। কিন্তু তখনও আসেনি। এ বাড়ির কর্তা সিংহমশায় অবশ্য ঘড়ি ধরে চলেন। তার খাওয়া হয়ে যায় বারোটার সময়। স্কুলে সকালে যান, স্কুল শুরু করিয়ে ওই সময় এসে খেয়ে এক পিরিয়ড গভীর নিদ্রা দিয়ে উঠে আবার স্কুলে যান। থাকেন সন্ধ্যা অবধি।

পটলের পিসীমা ওকে খাইয়ে নিদ্রার ব্যবস্থা করে ঘরের কাজ করছিল হঠাৎ ওই বিকট চীৎকার শুনে বাইরে এসে পটলাকে ওই অবস্থায় দেখে চমকে ওঠে।

—তুই! পটল! একি ব্যাপার? এত মালপত্র নিয়ে তুই—

পটল এবার পিসীমাকে দেখে কিছুটা ভরসা পেয়ে বলে 'সেলফ হেলপ্' করছিলাম। মানে নিজের জিনিস নিজেই আনছিলাম তা ওই—

ফের সেই বুক কাঁপানো গর্জন শুনে পটলা ভীতচকিত চাহনি মেলে চাইল। পিসীমা বুঝতে পেরে বলে।

—ওমা। তোর পিসেমশাই-এর নাক ডাকছেরে।



—এঁ্যা! তাই নাকি। পটলা এবার চমকে ওঠে। পিসীমা বলে—ঘুমুলে সিংহমশায়ের নাক ডাকে কিনা। আয় বাবা—উঃ এত দেরী হ'ল।

জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিয়ে সিংহের গুহাতে প্রবিষ্ট হল পটল চন্দর।

ততক্ষণে পিরিয়ড ওভার হয়ে গেছে। সিংহমশায়ের সবকিছু ওই পিরিয়ড ধরে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘুম—তারপর ঠিক ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি উঠে বাইরে এসে পটলাকে দেখে বলেন গুরুগম্ভীর স্বরে—এসে গেছো তাহলে? গুড। এবেলায় খেয়ে দেয়ে রেষ্ট নাও। ও বেলায় দেখা যাবে ইংরিজিটা।

পিসীমা বলে—এখন বাছা তেতে পুড়ে এল। ওসব রাখোতো।

সিংহমশায় বলেন—ওসবই আসল। ছাত্রানাং অধ্যয়নস্তনঃ। পড়াই ধ্যান জ্ঞান। ব্রত!

পটলা দেখছে ওর রাঙ্গা পিসেমশাইকে। নামটাও জবরদস্ত ওঁর। ডবল সিংহের সমাহার। নৃসিংহ মুরারী সিংহ। দেহটাও তেমনি দশাসই। আর রাঙ্গা পিসেমশাই না হয়ে আবলুশ পিসেমশাই হলেই নামটা মানানসই হতো। পটল তবু ওকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে যেতে হুঙ্কার ধ্বনিত হয়।

—চুল কোথায় কেটেছিলে? কলকাতায়? পটলা নীরব। পিসেমশাই পুনর্বার গর্জে ওঠেন।—এই প্যান্ট! একি দাঁড়িয়ে সেলাই করানো হয়েছিল দেহের সঙ্গে লেপ্টে? এঁ্যা!

পটল চমকে ওঠে। চুস প্যান্ট আর চুলও একটু বাহারেরই তার, অমিতাভ বচ্চনের ষ্টাইলে—যেন একটা বাবুই পাখীর বাসা। পিসেমশাই ওকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলেন।—চিত্তবিকৃতির জন্যই অধ্যয়নে মনোসংযোগ করতে পারো নি। এবার দেখছি।

পিসীমা কাতরস্বরে বলে—এখন বাছাকে ছেড়ে দাও। নাওয়া খাওয়া করুক বেচারা।

নেহাৎ দয়াপরবশ হয়েই সিংহমশায় বলেন।—ঠিক আছে। তাই

করুক। কিন্তু এরপর ওকে আমার ফর্মুলাতে চলতে হবে। গাধা পিটিয়ে বহু ঘোড়া বানিয়েছি। তোমার ভাইপোকেও এবার মানুষ করে দেবে এই এন-এম সিংহ। হাফপ্যাণ্ট আছে তোমার না সব এমনি জিনিসই এনেছো ?

—হাফ প্যাণ্ট ! পটলা বলে—একটা এনেছি খেলা করার জন্য। গর্জে ওঠেন সিংহমশায়—জীবনটা খেলা নয় ছোকরা। হাফ্‌প্যাণ্ট পরলে নিষ্ঠা বাড়ে, আর কাঁচাকলায় মেধা বাড়ে। কোন মন্ত্রী অবশ্য এসব কথা বলে বিপদে পড়েছিল। পড়াবইতো—এ যুগে সত্যকথা বল্লে তাকে ঠাট্টা করে লোকে। আই হেট দেম্। আমি স্কুলে যাচ্ছি। সিংহমশায় নিষ্ক্রান্ত হতে এবার পটল দম ফিরে পায়।

পিসীমা বলে—ওর কথাবার্তাই এমনি পটল। স্নানটান করে নে। আর কলকাতায় একটা পৌঁছানো সংবাদ দিয়ে চিঠি দে। সবাই ভালো আছে তো ? মা—দাদা বৌদিরা—

পটল ঘাড় নাড়ে। মনে হয় বলবে সে পটলাই মারা গেছে। পটলা সত্যিই মারা গেছে। আর একদিনের মধ্যেই সেটা ঘটেছে।

সকালেই সিংহমশায় ওকে নাপিত ডেকে চুল কাটিয়েছেন—চুল কাটাতো নয় ভেঁড়া কামানো। ভেড়ার গায়ের লোম যেমন ভাবে কেটে নেয়—ঠিক সেই ভাবেই নাপিত-নন্দন তার মাথার সেই ষ্টাইলিষ্ট চুলগুলোকে কেটে একদম ঘাড়-জুলপির শাঁস বের করে দিয়েছে। কদম ছাঁট করে ছাঁটা—আর পরনে হাফ প্যাণ্ট আর শার্ট।

কলকাতার সব চিহ্ন মুছে গেছে পটলের দেহ থেকে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার কান্না পায়। নিজেকেই চিনতে পারেনা। গর্জন ওঠে—পটলা, ব্যায়াম করেছো ? পঞ্চাশটা ডন-বৈঠক দিতে হবে।

—দিচ্ছিতো।



পিসেমশাই ওকে ভোরেই ঠেলে তুলে দেন। পটলার কলকাতায় বেলা সাতটায় ওঠা অভ্যাস। উঠে চা চাই।

আর এখানে ? শীতে কাঁপছে তবু হাফপ্যাণ্ট গেঞ্জি পরে ডন-বৈঠক দিয়ে চলেছে ? তারপর কলবেরুনো ছোলা—আদা—কাঁচা হলুদ আর একটু আখের গুড় দিয়ে জলপানি সেরে একটা ধুসো চাদর জড়িয়ে পড়তে বসতে হচ্ছে। তখন সূর্য কোথায় কে জানে—কাক পক্ষীরা কলবর করছে মাত্র।

—জোরে ? পষ্ট করে উচ্চারণ করো। প্রতিটি সিলেবল পষ্ট হবে। তারপর গ্রামার—ট্রানশ্লেশন করে আনো।

ওদিকে এর মধ্যে চার পাঁচজন ছাত্র বসে গিয়েছে। কে আর্তনাদ করে ওঠে—আঁক্ !

সিংহমশায়ের থাবার মৃদু পার্শ্বেই ছেলেটা ছিটকে পড়ে 'চিঁ চিঁ" করছে। গর্জাচ্ছেন সিংহস্যার—ভাওয়েল কনসোনেণ্ট জানিসনা ভয়েস চেঞ্জ করবি কি করে। মারবো এ্যাক রদ্দা—

সে বেচারার ভয়েস ভয়ের চোটেই চেঞ্জ করে গেছে। চিঁ চিঁ করে সে।—মারবেন না স্যার ! এবার ঠিক করেছি।

পটলার ট্রানশ্লেশন দেখে অভ্যাসমত সিংহমশায় ওর চুলের মুঠি ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। কারণ নাপিত এ ব্যাপারে পটলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সিংহমশায় বলেন। —কলকাতায় এই ইংরাজী শেখায় ? টেন্স ভার্ব এসবও জানিস না ? নিয়ে আয় গ্রামার।

পটলাকে নিয়ে পিসেমশাই আড়ং ধোলাই শুরু করেন। ইংরাজী তারপর অঙ্ক। বৈকালে আবার সেই রগড়ানি। চলে অধিক রাত্রি অবধি।

এছাড়া পটলার অন্য কাজও আছে। কয়েকজন ছাত্রও সেই কাজ করে। সিংহমশায়ের বাড়ির লাগোয়া একটানা লম্বা একটা ব্যারাকমত ঘর খোপ খোপ করা, সেখানেও কয়েকজন গরীব ছাত্র থাকে। বোচা—পরাণ আরও অনেকেই। সকালে পড়াশোনার পর

তাদের দৈহিক পরিশ্রমও কিছু করতে হয়। অবশ্য সিংহমশায় বলেন —এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং।

নিঃসন্তান সিংহমশায়ের আশ্রয়ে থেকে ওরা পড়াশোনা করে। তাঁর বাগান ক্ষেতে ধান শাকসব্জী যা হয় তাই থেকেই ওদের খাওয়া চলে।

তাই বাগানেও কমবেশী কাজ করতে হয় তাদের। পটলকেও বলেন সিংহমশায় কায়িক পরিশ্রমও দরকার। কোদাল চালাতে হবে।

পিসীমা আড়ালে বলে—কি বলছো গো? দাদা শুনলে সিংহ-মশায় গর্জে ওঠেন—তোমার দাদা ছেলেকে অমানুষ করে তুলেছিল আমি এই এন এম সিংহ ওকে মানুষ করে দেব। নো টক্!

পিসীমা চেনে কর্তাকে। তাই চুপ করে যায়। পটলা তখন কোদাল চালাচ্ছে কলাবাগানে। তাদের কলকাতার বাড়িতে রোজই মুর্গী কাটা হয়, এখানে সিংহমশায়ের আস্তানায় 'নো মাংস' তিনি নিরামিষে বিশ্বাসী। তাই রোজ এখানে কলাগাছ কাটা হচ্ছে। থোড়-মোচা-কাঁচাকলা-গর্ভমোচা-কলা এভরিথিং রোজ চাই, তৎসহ পেঁপে-ডুমুর-সিম-বাঁধাকপি আর তারকেশ্বরের কুমড়ো। তার সঙ্গে হড়হড়ে ডাল।

পটলার কান্না আসে খেতে বসে। পিসীমা প্রথম প্রথম আড়ালে ডিম মাছ-এর ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সিংহমশায়ের গোচরে আসতে তিনি সাবধান করে দেন।

কোন পক্ষপাতিত্ব চলবে না এখানে। ও পিসীমার আদর খেতে আসেনি। গুরুগৃহে এসেছে অধ্যয়ন করতে। কৃচ্ছ সাধন করতেই হবে। না পারে ওকে 'রিটার্ন টু সেণ্ডার' করে দেবে এই এন এম সিংহ।

ওর ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবেই পিসীমা চুপ করে যায়। ক'টা মাস এই চলছে, পটলার যেমন অদৃষ্ট। পটলার ক'মাসেই চেহারা একেবারে



বদলে গেছে। কদম ছাঁট চুল, খালি পায়ে চলাফেরা করে পা ধূলি ধূসর, সেই কলকাতাইয়া কমনীয়তা কিছুমাত্র নেই। পরনে হাফ প্যাণ্ট ময়লা সার্ট!

ভোর থেকে পড়া আর কাজ। দুপুরেও পড়া—সন্ধ্যাতেও। অবশ্য মাস দুয়েকের মধ্যে পটলা এখন ইংরেজীতে ভালো লিখতে পারছে, অঙ্কগুলোও আর জটিল ঠেকে না, বাংলা-সংস্কৃতও বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। এখন আকবর আর শাহাজাহানে একাকার করে দেয় না। প্রথম থেকে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ মায় তার সন তারিখও সঠিক বলতে পারে। জ্যামিতি থিয়োরম প্রবলেমও গুলিয়ে যায় না।

তবে ওই থোড় আর ডুমুর পেঁপে এখনও ঠিক রপ্ত করতে পারেনি। তবে কোদাল চালাতে শিখে গেছে। কিন্তু তারকেশ্বরের কুমড়োটা আদৌ সহ্য হচ্ছে না তাই পেটের অসুখ ধরিয়েছে। ফলে থানকুনি পাতাও গিলতে হচ্ছে।

কলকাতায় এসব খবর আমরা পেয়েছিলাম পরে, আমিই মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যাই। সেখানে নাকি চিঠি আসে পটলা ভালো আছে। ইংরেজী কেন সব সাবজেক্টে প্রভূত উন্নতি করে চলেছে।

এদিকে আমাদের দারুণ অবনতি ঘটেছে। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। মাঠে আর খেলা ধুলো নেই ফলে ঘাস গজিয়েছে। আমরাও সেই অনিল কেবিন, গোকুল কুলপী ওয়ালার তাগাদার চোটে ক্লাব ছাড়া প্রায়।

ফটিকই মাঝে মাঝে যায় আর ক্লাবের ঘরটায় গোবরার মামা এখন কুমড়োর গুদাম করেছে। অবশ্য দরকার হলেই কুমড়ো সব সরিয়ে নেবে বলেছে। এখন তারকেশ্বর থেকে ওরা ট্রাকবন্দী কুমড়ো এনে 'হোলসেল' এ বিক্রি করছে। গোবরাও কুমড়ো পটাশ হয়ে উঠেছে কুমড়োর কমিশনে। ট্রাক নিয়ে তারকেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে।

তবু হোঁৎকা বলে—এতবড় 'ডিবিট'টা মাইনা নিতে হবে? নেভার!

আমি জানাই পটলা ফিরে আসুক হোঁৎকা বলে—যাদের পটলা নাই তাগোর কেলাব নাই? পটলা একটা 'ট্রেটার', আমাগোর ফেলে থুইয়া পিসীমার আদর খাইতেছে। মাছ মাংস সাঁটতেছে। ওরে ছাইড়া ক্লাব করুম।

ফটিক বলে—নাহলে তুমাসে একটা পোষ্টকার্ড দেয়নি। এই বন্ধু? ও নিজের তালে আছেরে। ও সেলফিস্ জায়েণ্ট!

চুপ করে থাকি। বলি কি ভেবে।—কেমন আছে কে জানে। ওর ঠাকুমা তো কাল বলছিল ছোটকাকাকে খবর নিতে। ঠাক্‌মা নাকি ওকে আনতে চায় এখানে।

হোঁৎকা কি ভেবে বলে—ঠাক্‌মার কাছে খবর নে। গোবরা বলে—শায়েস্তাগঞ্জের কাছে তো আমাদের ট্রাক যায়, এই শনিবার নবীগঞ্জের মেলা। প্রচুর কুমড়ো আসে কিনতে যাবো।

ফুঁসে ওঠে হোঁৎকা—তুই থাম দিনি কুমড়ো পটাস? তর মামার কুমড়ো হঠিয়ে নিতি ক। ক্লাব না কুমড়োর গুদাম? হক্কলে হাসতিছে।

গোবরা চুপ করে যায়।

ঠাক্‌মা অবশ্য কিছুদিন পর পটলার অভাবটা বুঝতে পারেন। পটলাই এ বাড়ির একমাত্র বংশধর। তাকে এখানে রেখে ভালো মাষ্টার দিয়ে পড়ালেই পারতো। কিন্তু ছেলেরা তা করেনি। এবার ঠাক্‌মা বলে—পটলার ওখানে ঢের পড়া হয়েছে। এবার আন ওকে। সরোজও লিখছে ওখানে নাকি পটলার শরীর টিকছে না।

সরোজ পটলার পিসীমার নাম? পিসীমা অবশ্য পটলাকে ওইভাবে থাকতে দেখে খুশি হয়নি। তার স্বামীর উপর কথা বলতে না পারলেও ঠারে ঠোরে মাঝে কিছুটা আভাস দিয়েছে বোধহয় চিঠিতে।



কিন্তু ছোটকা বলেন—পটলা আরও একটা মাস থেকে তৈরী হয়ে আসুক। এখন তো কষ্ট করার সময়। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না মা।

ঠাক্‌মার ওইখানেই আপত্তি। কিন্তু ছেলেদের মত করাতে পারেন নি।

তাই আমার কথায় বলেন পটলাকে একবার দেখে এসো না। কাছেই তো। গাড়ি ভাড়া টাড়া যা লাগে বলে নিজেই পঞ্চাশটাকা গছিয়ে দেন ঠাক্‌মা।

হোঁৎকা সব শুনে বলে—ওর তো কেস গড়বড় মনে লয়। শায়েস্তাগঞ্জে লই যাই পটলারে শায়েস্তা করনের ব্যবস্থাই হইছে। ওরে উদ্ধার করতি লাগ্‌বো।

আমি বলি—উদ্ধার করে কাম নাই, ওর বাবা কাকারা বুঝবে। শুধু খবরটা নিয়ে আসতে হবে।

গোবরা বলে—এ এ আর শক্ত কাম কি? নবীগঞ্জের মেলায় যাবো কুমড়ো কিনতে, তোরা ওই ফাঁকে খবর নিয়ে আসবি। কাছেই তো। চল আজ রাতেই ট্রাক যাবে।

কুমড়ো নিয়ে যে এমন বাণিজ্য হয় তা জানা ছিল না। মাঝ রাতে ট্রাক নিয়ে বের হয়েছে গোবরা; ডানকুনি সিঙ্গুর হয়ে হরিপালের কাছে এসে সেই রাস্তা ছেড়ে আমরা চলেছি নবীগঞ্জের দিকে। দুদিকে মুক্ত প্রান্তর ধানক্ষেত, দুচারটে গ্রামবসতও দেখা যায়। তখন সকাল হতে চলেছে।

ট্রাকওয়ালা কোন মোকামে কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মালপত্র খালাস করে এবার আমাদের নিয়ে কুমড়ো গ্যস্ত করতে চলেছে নবীগঞ্জে।

নবীগঞ্জের মদনমোহনের মেলার খুবই নামডাক। দূর দূরান্তরের গ্রাম গঞ্জ থেকে কাতারে কাতারে লোকজন আসে। কারণ মদন-মোহন নাকি খুবই জাগ্রত। সারা বছর ধরে এই এলাকার মানুষ

নানা আশা নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে মানসিক করে এই মেলার সময় সেই ঋণ শোধ করতে আসে।

বেশ বড়সড় মন্দির নাটমন্দির, সামনে বড় দিঘী। গাছগাছালি ঘেরা চত্বর। আর ওদিকে ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে সাতদিন ধরে মেলা বসে।

দিনরাত মেলা জমে থাকে। বড় বড় দোকান-পশার আসে। জামা কাপড়, মনোহারি রকমারি মিষ্টির দোকান সার্কাস-ম্যাজিক পুতুলনাচ-যাত্রা এসব তো হয়ই বিদ্যুৎ চালিত আকাশ ছোঁয়া নাগর-দোলা আসে, আরও হাজারো রকম আকর্ষণের আমদানী হয়। এছাড়া গরুর গাড়ির চাকা, লাঙ্গল কপাট জানলা—সবই আসে। আর চারিদিকে চাষীদের এলাকা। তাই কৃষিবিভাগ থেকে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দেড় হাত মুলো, এক কাঁদিতে দেড়শো নারকেল তিরিশ কেজি সাইজের কুমড়ো, চোদ্দ হাত লম্বা আখ, চার সের বেগুন এসবও আনা হয় প্রদর্শনীতে। আর আসে কুমড়ো।

ফলে লোকজন ভেঙ্গে পড়ে। এই ক'দিন শায়েস্তাগঞ্জের স্কুলের ছেলেদের নিয়ে স্বয়ং এন এম সিংহমশায় মেলায় পুলিশকে সহযোগিতা করেন। দলে দলে ভলেনটিয়ার থাকে মেলায়, বিশেষ করে মন্দিরের আশেপাশে, প্রবেশ দ্বারেও মাইকে অনবরত ঘোষণা করা হচ্ছে কে কোথায় হারিয়ে গেছে। কাকে ফার্স্ট এড দিতে হবে। জনতা কোনদিকে যাবে ইত্যাদি।

ওই জনসমুদ্র দেখি আমরাও। আর দেখি মাঠে টাল দরুণে গাদা করা নধর সাইজের কুমড়ো। টাল হিসেবে দর। খুচরো ব্যাপার নেই। পাহাড় প্রমাণ কুমড়ো।

হোঁৎকা বলে—তুই মাল কেন গোবরা, দেহি শায়েস্তাগঞ্জের খবর নিইগা।

দুতিনজন রোগা পটকা খোঁড়া বোঁচা ছেলে জামার উপর লাল



ফিতে আলপিন দিয়ে আটকানো, তারা বলে—ট্রাক এখানে নয় ওদিকে রাখো।

একদল আবার পথে দড়ি ধরে একবার এদিক চেপে মেয়েদের যাবার পথ করছে, তারা কিছু চলে গেলে, দড়িটা ওদিকে চেপে এবার পুরুষদের যেতে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার বাঁশী বাজিয়ে সংকেতও হচ্ছে।

একজন কালো মুগুরমার্কা দেহ নিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে। সব যেন ঠিক মত হয় বয়েজ। স্নান যাত্রার ভিড় বি কেয়ার ফুল। ভলেন-টিয়ার্স ট্রাক গাড়ি সব এখন হঠিয়ে দাও ওদিকে।

একটা সর্দার মত ছেলে নাচতে নাচতে বলে সব ঠিক হবে স্যার।

স্যার ওদিকে চলে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। চীৎকার করে পেংটি ভলেনটিয়ারের দল গাড়ি হঠাও!

হোঁৎকা বলে—হালায় আদাড় গাঁয়ে শিয়াল রাজা হইছে। আমাগোর শেখায় ভলেনটিয়ারি।

ওরা চীৎকার করে গাড়ি সরান। এখন কুমড়ো কেনা চলবে না। হোঁৎকা বলে—এহানে তো ভিড় নাই।

একজন বলে আবার জবাব। ওরে ক্যাপ্টেন সুভাষ দাকে খবর দে।

হোঁৎকা হেসে ওঠে। বলেসে—

—আর্সুলা আবার পক্ষী, তোমাগোর আবার ক্যাপটেন? তারেই ডাকো, দেহি ক্যামন ক্যাপটেন।

ডাকতে হয় না, পি পি বাঁশী বাজছে। ভলেনটিয়ার বাহিনীও এমন অবাধ্য লোকদের দেখেনি। স্বয়ং ক্যাপটেনই এসে পড়েছে। চীৎকার করে সে।

ক্ কি কি হয়েছে? এখানে এত ভি-ভিড় কেন? ট-ট্রাক হঠাও।

হঠাৎ আমাদের দেখে পটলা চমকে ওঠে। ওর বীর দর্প থেমে



www.arisumu.com

গেছে। এগিয়ে আসে সে। কতদিন পর আমাদের দেখছে। জিবটা আলটাকরায় সেঁটে গেছে।

ত্ ত্ ত্ তোরা! এখানে?

আমরা প্রথমে ক্যাপটেনকে চিনতেই পারিনি। পটলার সেই তেলচুকচুকে অমিতাভ বচ্চন মার্কা চুল একদম কদমছাঁট করে ছাঁটা, পরনে নড়বড়ে হাফপ্যান্ট আর খাকি শার্ট, ধূলিধূসর পায়ে একজোড়া পুরোনো কেডস। মুখের সেই নধর ভাবটাব গিয়ে শীতের রুক্ষতা ফুটে উঠেছে, আর আধখানা হয়ে গেছে। ঈষৎ ল্যাংচাচ্ছে ওই ছাত্র-বাহিনীর মতই, কপালেও একটা নোতুন কাটা দাগ পটলার বদনকে বদলে দিয়েছে একেবারে। এ যেন অন্য পটলা কোন অজ গাইয়া।

চমকে উঠি আমরাও। পটলাকে এখানে এইভাবে আবিষ্কার করবো ভাবিনি।

—তুই! পটলা এখানে? একি হাল হয়েছে তোর? পটলাও তা জানে। তাই অভিমান ভরে বলে।—ক'ক'দিন পর শোকসভাই করতিস। কেন এলি?

হোঁৎকা বলে—ইংরাজী ক্যামন পাকা হইছিস তাই দেখতে কইছে তোর ঠাক্‌মায়?

ঠাক্‌মার নাম শুনে পটলা বলে।—ঠাক্‌মারে কইবি পটলা মরে গেছে। ডেড, এণ্ড গান্। গো 'ভারবের' পাষ্ট পারটিসিপল হয়ে গেছে গান্ ফট! আর কলকাতা বোধহয় ফেরা হবে না রে!

আমি ওকে ছাড়তে চাই না। পটলাকে এমনি করুণ অবস্থায় দেখে আমারও কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি, পটলা মোটেই ভালো নেই. ক্লান্ত শীর্ণ চেহারা। ওর ঠাক্‌মা—মা হয়তো সব খবর জানেন না। বলি।

—আমাদের সঙ্গে কলকাতা ফিরে চল ট্রাকে।

পটলা বলে—সিংহমশায়কে চিনিস না। খবর পেলে তোদেরও ধরে নে গিয়ে দাগী করে ইংরাজী শেখাবে অঙ্ক কষাবে। দেখছিস না এদের?



ভলেনটিয়ার বাহিনীর প্রায় সকলেরই দেখি কেউ খোঁড়া—কারো কপাল কাটা; শুধোই।—ক্যামন মাষ্টার রে!

পটলা বলে—তাই বলছি আমি মরছি, লেট মি ডাই। তোরা পালা। হোঁৎকা গর্জে ওঠে—ঢের দেখছি এ্যামন মাষ্টার? চল তুইনা যাস্ তরে কল্লা ধরি ট্রাকে তুলে লই যামু তর ঠাক্‌মার কাছে। যা করার ওই করবে।

হোঁৎকা পটলার জীর্ণ জামার কলার টেনে ধরে ওকে ট্রাকের দিকে নিয়ে চলেছে।

ভলেনটিয়ারের দল ও তাদের ক্যাপ্টেনকে এভাবে টেনে হিচড়ে ট্রাকজাত করতে দেখে একসঙ্গে ফুঁ ফাঁ শব্দে গোটা কতক বাঁশী বাজাতে শুরু করেছে। দু চারজন ল্যাংচা মার্কা ভলেনটিয়ার এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করতে তারাও হোঁৎকা আর ফটিকের মারের চোটে ছিটকে পড়েছে। কলরব ওঠে মেলায়।

দৌড়ে আসছে লোকজন। এত লোকের মাঝে ভলেনটিয়ারের ক্যাপটেনকে তুলে নিয়ে যাবে এ হতে দেবে না।

আমরাও বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারি।

গোবরাও এর মধ্যে বেশ বাছাই সাইজের কুমড়োতে ট্রাক প্রায় বোঝাই করে তুলেছে, লোকজন এর মধ্যেই দোকানের ঝাঁপ-এর বাঁশ-লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে।

ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় বিশাল দেহী সিংহমশায়কে, বীরদর্পে হুঙ্কার ছাড়েন ষ্টপ দেম! থামাও—ওরা পটলাকে কিডন্যাপ করছে।

আমাদের আর থামার উপায় নেই, দেরী করলে গণধোলাই-এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পালাতেই হবে। তাই পটলা সমেত ট্রাকে উঠেছি। জনতা ট্রাক ঘিরে ফেলার উপক্রম করছে।

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এসে যায়।

হোঁৎকা ওই সামনের জনতার উপর ট্রাক থেকে একটা আধমণি কুমড়ো তুলে ছুঁড়ে দেয়। বিরাট কুমড়োটা পড়েছে কার মাথায়

তারপর মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হয়ে যায়, তারপরই ছুঁড়ছে আর একখান! কুমড়ো যে এমনি শব্দ করে বিস্ফোরিত হয় জানা ছিল না, আর এমনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাও অজ্ঞাত ছিল॥

আচমকা কুমড়ার আক্রমণে সামনের জনতা সরে যায়, কে চীৎকার করে বোমা বোমা মারছে—

সামনে খালিরাস্তা ট্রাকওয়ালা এবার পঞ্চাশ মাইল গতিবেগ তুলে ছুটছে, পিছনে যারা তাড়া করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে দু চারটে দশ কেজি সাইজের কুমড়ো ছুঁড়তে তারাও কেটে পড়েছে।

ট্রাক তখন নবীগঞ্জের মেলা ছাড়িয়ে তারকেশ্বর রোডের দিকে ছুটে চলেছে, গোবরাও খুশি। গোলমালে কুমড়ো মহাজনকে দামও দিতে পারেনি। মামার থেকেও সেটা ম্যানেজ হয়ে যাবে।

কলকাতা পৌঁছলাম তখন বৈকাল হয়ে গেছে।

ঠাকমা পটলাকে ওই অবস্থায় দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। ওর মাও অবাক হন। ঠাকমা বলেন—ওকে এনে ভালোই করেছিস তোরা। এখানেই বাকী পড়াটা করুক।

ছোটকা গম্ভীর হয়ে যান।

অবশ্য সিংহমশায়ের উদ্যম বৃথা যায়নি। পটলা ওই ক'মাসের পড়াতেই ফার্স্ট ডিভিশনে গেছল।



## হোঁৎকাদার সেবাব্রত

হোঁৎকাদা বলে—তালে ওই কথাই রইল। ঝুলনের মেলায় এবার সেবা-টেবার কাজে ফোর স্কোয়ার ক্লাবকে রেকর্ড করতেই হবে।

গুপীনাথ তখনও হুস-হাস শব্দে বৈঠকি দিয়ে চলেছে। এবার দম ফেলে হাঁকে—আড়াই শো!

অর্থাৎ নিদেন আড়াই শো বৈঠকি না দিয়ে ওর ব্যায়াম শেষ হয় না। ওদিকে পটলা ক্লাব-ঘরে তখনও হারমোনিয়ামে পোঁ-পোঁ শব্দ তুলে ক্লাবের উৎসবের জন্যে গান তুলছে।

—কি গাব আজি কি শুনাব—

হোঁৎকাদা ধমকে ওঠে—ওই সব থামা দিকি! এখন কাজের কথায় আয়। অ্যাই শ্রী মতি তোর একটো থামা দিকি!

মতিলাল আমাদের ক্লাবের নাট্য-পরিচালক কাম হিরো। সামনের মাসে ক্লাবের নাটক, তারই মক্‌শো করছিল। হোঁৎকাদার কথায় ওরাও এসে জুটেছে। হোঁৎকাদা বলে—সামনে এত বড় কাজ, এখন ক্লাবের প-প্রেস্‌টিজ বলে কথা! পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব তো উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা বসে থাকব?

মতিলাল বলে—কি করতে হবে? ফাইটিং?

হোঁৎকাদা জানায়—সেবা! জনসেবা! মানে ভিড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ল, হারিয়ে গেল, খুঁজে আনতে হবে। কেউ পথ হারিয়েছে, অফিসে আনতে হবে। কেউ অসুস্থ, তাকে ফাস্ট-এড দিতে হবে। কোন দুষ্ট লোক, মানে চোর পকেটমারকে বাধা দিতে হবে।

গুপী বলে—শেষের কাজটা আমিই করব।

হোঁৎকাদা বলে—সব অর্গাইনাইজ করতে হবে। বুঝলে, জন-সেবাই আসল কাজ। বি—বিবেকানন্দ বলেছেন—জ-জীবে—

মতিলাল পাদপূরণ করে দেয় বাকীটা।

আমাদের গ্রামটা বিরাটই বলা যায়। এখনও অনেক ধসে পড়া জমিদার বাড়ি, খালবিল, গজিয়ে ওঠা আদকদের কাঁচের ঠাকুরবাড়ি, মোহান্ত মহারাজের বিরাট মন্দির, আরও অনেক ছোটবড় মন্দির, ঠাকুরবাড়ি আছে। ইদানীং বিজলিবাতির দৌলতে মন্দিরের বোল-



বোলাও সাজ-গোজও বেড়েছে। ঝুলনের সময় তাই প্রতি ঠাকুর-বাড়িতেই ঠাকুর সাজানো হয়। ধুমধাম করে মেলা বসে। আদকদের চত্বরে কলকাতার যাত্রাগানও হয়। নামী কীর্তনীয়ারাও আসেন। ক'দিনের জন্য গ্রামটা জমে ওঠে। আর আশপাশের গ্রাম থেকে আসে হাজার হাজার মানুষ। পথঘাট, বাজার, মেলার জায়গায় লোক ধরে না।

তাই হোঁৎকাদা এই সুযোগে জনসেবা করে কিছু পুণ্যি অর্জন, আর ক্লাবের নাম ফাটাবার সুযোগটা ছাড়তে চায় না। হোঁৎকাদা এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কালীতলার মাঠে একটা তেরপলের ছাউনি বানিয়ে নিজের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা থেকে হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার, নড়বড়ে বেঞ্চ, আর কোত্থেকে একটা ফোল্ডিং টেবিল পেতেছে। লাল শালু দিয়ে ফোর স্কোয়ার ক্লাবের সেবা-বিভাগের প্রচার করা হয়েছে। হোঁৎকাদা গ্রামের অনেক কিছুতেই থাকে। ফুটবল মাঠের রেফারী, প্রসেশনের লীডার, ব্যাণ্ড-পার্টির ম্যানেজার ইত্যাদি নানা রকমে সে জনসেবা করে চলেছে। আজ খাকি হাফ-প্যান্ট, শার্ট আর মাথায় টুপি, বেল্টে হুইশেল ঝুলিয়ে প্যামসু পায়ে হোঁৎকাদা গোল দেহটাকে আরও গোলাকার বানিয়ে চেয়ার জাঁকিয়ে কম্যাণ্ডার সেজে বসেছে।

আর সেবকদেরও অভাব নেই। আমি, গুপী, মতি, পটলা ছাড়া পাড়ার ক্ষুদিরাম, দুকড়ি, দেড় ঠেঙ্গে হরিপদ, কানা শশী, নুলো তারণ ইত্যাদি অনেকেই হোঁৎকাদার সেবাব্রতে সাড়া দিয়ে জমায়েত হয়েছি তার পতাকা তলে।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের টেন্ট ওদিকেই। তাদেরও বাহার কম নয়। পশুপতিদা মাথায় ব্যাণ্ড-পার্টির পালক গোঁজা টুপি পরে বিউগিল নিয়ে সেজেছে। ওদের দলের পোশাকও জমকালো। ওদের ক্লাবের গদাই বলে—ভাল মানিয়েছে রে তোদের পিপেটিকে, গড়িয়ে দিলেই—

গুপী গর্জে ওঠে হোঁৎকাদার প্রতি এই মন্তব্যে। তাই গর্জে ওঠে—কথা বলবি না গদাই, তোকেই সেবা করে দেব এক রদ্দায়। অবশ্য গুপীর হাতের রদ্দা খেলে গদাইকে লাশ হয়ে যেতে হবে। তাই আমি থামাই ওদের—এই, সেবাদলের নিজেদের মধ্যে সেবা শুরু করবি নাকি?

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের তাঁবুতে ব্যাণ্ড বাজছে। ভিড় জমেছে ওখানেই। হোঁৎকাদাও হুইশেল বাজিয়ে দেড় ঠেঙ্গে হরিপদ, কানা শশী, নুলো তারণ, লিকলিকে কার্তিকদের নিয়ে রীতিমত প্যারেড শুরু করিয়ে তালিম দিয়ে সেবাব্রতী করে ছাড়বে।

সন্ধ্যার পর থেকে ভিড় শুরু হয়। কাতারে কাতারে ছেলে মেয়ে, বুড়ো-বুড়ীর দল চাল চিঁড়ে বেঁধে এসেছে। মন্দিরগুলোর দরজায় ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চলেছে। বাঁশ পুঁতে দড়ি-দড়া বেঁধে ভিড় সামলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু জনস্রোতের চাপে, সব বানের মুখে খড়কুটো হয়ে ভেসে যাচ্ছে।

হোঁৎকাদার গলা শোনা যায়—রেডি, স্টেডি বয়েজ। মহিলারা এদিকে—ওয়ান বাই ওয়ান। পুরুষদের গেট বন্ধ করে রাখো। হুঁশিয়ার—

আদকমশাইও রয়েছেন। ভিড় সামলাতে গিয়ে নুলো, তারণ ছিটকে পড়েছে, লিকলিকে কার্তিক চাপের চোটে কোন দর্শনার্থীর ঘাড়ে উঠে ভিড় থেকে আত্মরক্ষা করছে।

আমরাও স্ট্রেচার নিয়ে তৈরী। দু-একটা বোধ হয় জখম হবেই। তবু সেবা করার সুযোগ পাব। কিন্তু মানুষগুলো যেন ইস্পাতের তৈরী! এত ভিড়েও কারোও কিছু হয় না!

কলরব ওঠে—পুঁটু, কোথায় গেলি র‍্যা! অ-কুসুম—

—ছেলে হারিয়ে গেছে মা? হোঁৎকা এগিয়ে যায় ব্যগ্রভাবে।

বুড়ী দাঁত পড়া লালচে মাড়ী বের করে খিঁচিয়ে ওঠে—পুঁটু আমার হারাবে কেন র‍্যা মুখপোড়া? তুই হারা গে না!

পুঁটু, বুঁচু কেউই হারায় না। কেউ আহতও হয় না। মেলার



পর্বও ঠিক চলেছে। আদকমশাই বলেন—দ্বারোয়ানদের বলে রেখেছি।

হোঁৎকাদা বলে—আমার সেবাদলও রেডি আছে আদকবাবু, মানে এবার ফোর স্কোয়ার ক্লাবের পেট্রন হতেই হবে। আপনার এখানেই তাই সেবাদলকে রেখেছি।

আদকমশাই জবাব দেয়—সেবাদল! ওরা কি করবে হে? যাক গে, এবার ডেকরেশনটা কেমন হয়েছে বল হোঁৎকা? ফোকাস্, স্পষ্ট লাইট ওই ঠাকুরের ভ্যানিস-ট্যানিস সবই কলকাতার মিস্ত্রী এনে করিয়েছি।

আবার ভিড় আসছে জনস্রোতের মত। আমরাও ক্ষুণ্ণ হয়েছি। আদকমশাই কেন মোহান্ত মহারাজের ঠাকুরবাড়িও ম্যানেজ করছি, কিন্তু ওরা যেন আমাদের চেনে না!

—রেডি বয়েজ। পুরুষদের গেট খুলে দাও। ওরা বের হয়ে গেলে মেয়েরা ঢুকবে! আস্তে—

কোনরকমে সেবা করার সুযোগ খুঁজছি। রাত হয়েছে। হোঁৎকাদা বলে—চারিদিকে সাবধানি দৃষ্টি রাখবি। শুনছি, দু-একটা ছেনতাইও হয়ে গেছে।

ক্যাম্পের নড়বড়ে বেঞ্চে বসে আছে কয়েকটা বুড়ো-বুড়ী—দুটো ছেলে। হোঁৎকাদা বলে—আপনাদের নাম বলুন।

বুড়ো গর্জে ওঠে—আমরা কি চুরির আসামী যে নাম-ধাম গাঁ-গোত্তর বলতে হবে?

—আপনারা তো হারিয়ে গেছেন?

হোঁৎকাদার কথায় বুড়ী গর্জে ওঠে—সদাব্রত খুলেছো, খেতে থাকতে দেবে শোনলাম, আর যাত্রীদের চোর ঠাওরেছে!

মতিলাল বলে—সেবাব্রত নিইছি আমরা—সদাব্রত নয়।

—ঝ্যাঁটা মারি তোদের মুয়ে, আঁটকুড়োর ব্যাটারা! মশকরা করতে এসেছো! ওঠ রে মদনা, অ্যাই কালী, চত্বরে পড়ে ঘুমোবি চল।

ঘুমন্ত কিল্লিবিল্লিদের নিয়ে ওরা চলে গেল।

রাত হয়ে গেছে। খিদেতে পেট জ্বলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা-গতর টাটিয়ে গেছে, তবু সেবাদলের নামও কেউ করে না। আদক-মশাইকে ধরে কিছু মোটা টাকার ডোনেশন তোলার স্বপ্ন দেখেছিলাম। তাও হল না। ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের তাঁবুর সামনে বেঞ্চ পেতে ভলেনটিয়ারদের লুচি, আলুর দম আর মিহিদানা ভোগ চলছে।

নুলো তারণ ওর ছেঁড়া জামা থেকে ব্যাচটা খুলে হোঁৎকাদার টেবিলে রেখে বলে—লুচি-ফুচি নাই, এতে আমিও নাই। কাল থেকে ওদের দলেই সেবা করব।

দেড় ঠেঙ্গে হরিপদের ছোট এক ঠ্যাং-এর হাঁটুটা ছড়ে গেছে। ও বলে—আমোও নাই কাল থেকে।

হোঁৎকাদা বলে—সেবা মানেই নিঃস্বার্থ সেবা। দই লুচি আলুর দম মিহিদানা তো তুচ্ছ।

যে কারণেই হোক পরদিন ফোর স্কোয়ার ক্লাবের অবস্থা সত্যই করুণ। মাত্র ক'জন টিম-টিম করছে। ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সামনে ভলেনটিয়ার আর ধরে না। নুলো তারণ, কানা শশী, লিকলিকে কার্তিকও চলে গেছে ওই ক্যাম্পে। বুকে ওদের ব্যাজ এঁটে সেবাধর্ম নিয়েছে। আর দেড় ঠেঙ্গে হরিপদও যেত, কিন্তু এক ঠ্যাং জখম হওয়ায় আসতে পারেনি।

এদিকে আমরা মাত্র ক'জন। হোঁৎকাদা বলে—নীরবে নিঃস্বার্থে সেবা করবি। জ-জানিস না—

য-যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে॥

লোকজনের ভিড় আজ অনেক বেশী। শহর থেকে রিজার্ভ বাসে লোকজন মেয়েরা আসছে। আজ আদকমশাই বলে—গেটে আমার দারোয়ানরাই থাকুক। তোমরা আশেপাশে থাক, অর্থাৎ তার দেউড়িতে তার ইউনিফর্ম পরা লোকজনই থাকবে, ওদিকে মোহান্ত



মহারাজের মন্দিরের ভার আজ পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের, আর আদকমশাইয়ের মন্দিরের ভিতরেও পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নেতা পশুপতিবাবু দলবল নিয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ এবার আদক-কোম্পানির দরাজ টাকা ওরাই পাবে।

আমি বলি—এসব তুলে দাও হোঁৎকাদা। কি হবে?

—মানে! হোঁৎকাদা গর্জে ওঠে—যদি ভালো না লাগে চলে যা তোরাও। আমি একাই সেবাব্রত নিয়ে থাকব।

মতিলাল থামায়—চুপ কর দিকি। কিন্তু কাজটা কি করব বল?

গোপীনাথ বলে—করার তো কিছু নেই। আদকমশাই, মোহান্ত মহারাজও জবাব দিলেন।

হোঁৎকাদা বলে—পথেঘাটে ঘুরবি, কত বিপন্ন মানুষ রয়েছে তাদের সেবা কর।

মনের রাগ চেপে ভিড়ের মধ্যে পথে এদিক ওদিক ঘুরছি। হোঁৎকাদাও বের হচ্ছে মাঝে মাঝে। ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ডিউটিতে রয়েছে ভলেনটিয়ার দল। গদাইও ব্যাচ পরে ভিড় ম্যানেজ করছে গেটে। আমাদের যেন চিনতেই পারে না।

ওদের লীডার পশুপতিবাবু ভিতরে যাবার মুখে শোনায়—বাজে ভিড় হটিয়ে দে গদাই, গেটের কাছ থেকে।

গুপীনাথ গজরাতে থাকে, পশুর বাবার জায়গা এটা! ঠিক আছে।

গুপীকে টেনে নিয়ে আসি, কারণ রাগের মাথায় ওর জ্ঞানগম্যি থাকে না।

হঠাৎ খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সারা মেলায় ওই ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। আর খবরের মূল ওই হোঁৎকাদা।

রাত হয়ে গেছে। দত্তদের রকে একটা লোক মরে পড়ে আছে। হইচই পড়ে যায়। হোঁৎকাদা বলে—কুইক। এখনও মরেনি, পালস্ আছে। স্ট্রেচার নিয়ে চল।

ভিড় জমে গেছে পথের দু'ধারে। তার মধ্য দিয়ে আমি, মতিলাল, পটলা স্ট্রেচারে তুলে আনছি দশাসই দেহটাকে। জ্ঞান নেই। হোঁৎকাদা হাঁক পাড়ে—ভিড় করো না কেউ, পথ দাও সেবাদলকে। ধীরে—নো জার্ক বয়েজ।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ছেলেরাও ঘাবড়ে যায়। তারা কেবল লোকই ঠেলেছে, ফাঁক থেকে আমাদের ক্লাব একটা মারাত্মক কেসকে তুলে এনেছে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে। এর মধ্যে ওই অজ্ঞান লোকটার আত্মীয়দের কাছেও খবর গেছে। ওর বৌ হবে বোধ হয়—ইয়া লম্বা চওড়া একটি কালো মহিলা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে করে আসছে, পিছনে আসছে বেঁটে খাটো একটি তরুণ—ওর ছেলে বোধহয়।

হোঁৎকাদা বলে—ওকে ডিস্টার্ব করবেন না। এখুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বোধ হয় হার্ট অ্যাটাক্—সাংঘাতিক ব্যাপার।

—বাঁচবে তো গো? ও বাবু! মেয়েটি চিৎকার করে চলেছে।

কোনরকমে ওই দশাসই দেহখানাকে নড়বড়ে টেবিলে শুইয়ে দম নিচ্ছি। এতখানি পথ ওই পর্বতকে বয়ে আনা কম কথা নয়! আমাদের ক্যাম্পের আশপাশে লোকের ভিড় আর ধরে না। নিমেষের মধ্যে ফোর স্কোয়ার দলের সেবাব্রতের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। হোঁৎকাদা লোকটার পালস দেখছে।

হঠাৎ কাণ্ডটা ঘটে যায়। বিরাট মুষকো লোকটা সটান টেবিলের উপর আড়িমুড়ি ছেড়ে সিধে হয়ে উঠে বসে চোখ কচলে নিজেকে তেরপলের ছাউনির মধ্যে এই অবস্থায় দেখে হকচকিয়ে যায়। ওপাশে বৌটা তখন চিৎকার করছে দেখে লোকটা গর্জে ওঠে—অ্যাই থামবি! তা এখানে কি করে এলাম রে? যাত্রা শুরু হবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম দত্তদের রকে—

বৌটা গর্জে ওঠে—তুমি নাকি মরে গেছলে গো।

লোকটা অবাক্ হয়—মরে গেছলাম! কোন্ ব্যাটা বলে?

মেয়েটা হোঁৎকাকে দেখিয়ে বলে, ওই ছোঁড়াটা! ওমা কি মুখ গো



ওটার? অ্যা! জলজ্যান্ত লোকটাকে মেরে ফেলছিল গো। ওরে আঁটকুড়ির ব্যাটা, ওই ছোঁড়াগুলো আবার খাটিয়ায় করে বয়ে আনছে।

—অ্যা! মরে গেছলাম! দেখাচ্ছি মজা! ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? মোটা লোকটা গর্জে ওঠে বুনো মোষের মত।

পায়ের দিকে ছিলাম আমি। লোকটা সজোরে আমার দিকেই লাথি ছুড়েছে। লাথি নয়, যেন একটা শালের গুঁড়িই এগিয়ে আসে। লাগলে থেঁৎলে যাব, তাই মাথা নীচু করে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরুবার পথ খুঁজছি। সেবা করার পর যে এমনি কাণ্ড ঘটবে ভাবিনি। লোকটা হাত বাড়িয়ে ঠেঙ্গ ধরে ফেলেছে হোঁৎকাদারই। এবার বোধহয় হাসপাতালেই যেতে হবে হোঁৎকাদাকে। এমন সময় দাপাদাপিতে নড়বড়ে টেবিলটা মচমচ করে ওঠে। একটা পায়া মড়মড় করে ভাঙ্গছে। মোটা লোকটা পড়বার আগেই সামলে নেবার জন্য লম্বা হাত বাড়িয়ে তেরপলের নীচেকার ছাউনির বাঁশটাকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু ওই বিরাট দেহের চাপে টেবিলটা আছড়ে পড়ে, আর তেরপল সমেত বাঁশ ভেঙ্গে ওই লোকটা, হোঁৎকাদা, সেই মেয়ে লোকজনই চাপা পড়ে গেছে। এই ফাঁকে আমি তেরপলের তলা গলে কোনরকমে হড়কে বের হয়ে মতিলালের হাত ধরে ভিড়ে মিশে যাই। বুকের ব্যাজটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে ওদের দলে মিশে কেটে পড়ার পথ দেখছি। ততক্ষণে বিরাট কাণ্ড বেধে গেছে। লোকজন, যাত্রীরা চিৎকার করছে। কোরাস শোনা যায়—মার! মার! সেবাব্রতের ব্যাটাদের হাড় গুঁড়িয়ে দে মেরে!

দম বন্ধ করে দৌড়চ্ছি বড় রাস্তা ছেড়ে। বড় বড় বাড়িগুলোর পেছনে একটা পুকুরের ধারে গাছ-গাছালির অন্ধকারে জায়গাটা থমথম করছে। ওইখানে এসে দাঁড়ালাম। লোকজন কেউ বিশেষ নেই এদিকে। আদকমশায়দের বিরাট বাড়িটার পেছনের বাগানে এসে পড়েছি। মতিলাল তখনও হাঁপাচ্ছে। গুপীনাথ রেডি আছে।

আড়াই বৈঠকি দেওয়া ওর অভ্যাস গুপীনাথ গুম হয়ে বলে—ঢের হয়েছে। এবার নানে মানে ঘরে ফিরে চল।

মতিলাল বলে—একটু দম নিতে দে। আর ওপথে নেই বাবা, ধরলে লাশ বানিয়ে দেবে।

আকাশ বাতাসে ওঠে আনন্দের সুর। ওদিক থেকে মাইকে গানের সুর শোনা যায়। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মাইকে ভলেনটিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—ভিড় সরিয়ে দাও। গেটে সারবন্দী যাত্রীদের যেতে সাহায্য করো।

ওরাই এবার টেক্কা দিয়ে গেল। আর হোঁৎকাদার বোকামিতে ফোর স্কোয়ার ক্লাব এবার পথে বসে গেল।

মতিলাল বলে—সামনের মাসে ফাংশন-নাটক এসব হবে না?

গুপী ধমকে ওঠে—যে নাটক করলি তাই সামলা এবার!

—হোঁৎকাদাকে রেসকিউ করবি না?

আমি ভয়ে ভয়ে বলি—মোটা লোকটা নির্ঘাৎ জোর ধোলাই দিয়েছে ক্যাপটেনকে।

গুপীনাথ বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এখন বাড়ি চল। এখন আমার হাতে ক্লাবের ফেস্টুনটা। রডে বাঁধা ওই লাল শালুর ফেস্টুনটা হাতিয়ে দৌড়েছিলাম।

অন্ধকারে হঠাৎ কিসের শব্দে চমকে উঠি। কে জানে কেউ বোধ হয় টের পেয়ে গেছে, তাই ধরতেই এসেছে আমাদের। কিন্তু ব্যাপার দেখে অবাক্ হই। আদক-বাড়ির দোতলার মহল থেকে দড়ি ধরে একটা লোক এসে ঝুপ করে পড়েছে ওই জঙ্গলে। আর একজনও নামছে। তার হাতে একটা ছোট বাক্স। বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটার পরনে কালো হাফ-প্যান্ট আর কালো গেঞ্জি। চমকে উঠে ঝোপের আড়ালে বসে আছি। ওদের কথাগুলো শোনা যায়। একজন বলছে—জোর হাতিয়েছি মাইরী! দু' দুটো গয়নার বাক্স। কর্তা-গিন্নীরা ঝুলনের যাত্রা শুনছে। শুনুক যাত্রা! চল, হাজার তিরিশ



টাকা তো হবেই। হীরের গহনা জড়োয়া সেট, চুনি পান্না, সোনা-দানা। তা বড়লোক বটে।

গায়ে ঘাম দিচ্ছে। সামনেই বিরাট একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। আর দুটো লোকের হাতে হাজার হাজার টাকার চোরাই গহনা।

গুপীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে, অন্ধকারে দু'চোখ জ্বলছে। আমিও ওর হাতের চাপে সজাগ হয়ে উঠেছি। আমার হাতে ফেস্টুনের একটা রড, অন্যটা গুপী টেনে নিয়ে তৈরী হয়েছে।

ঝোপের মধ্যে বসে আছি আমরা, মশায় কামড়াচ্ছে খেয়াল নেই। লোক দুটো ওই ঝোপের পাশের সরু পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই আমি সজোরে আগের লোকটার মাথাতেই রডের এক ঘা বসাতেই লোকটা সামনের দিকে ছিটকে পড়ল, আর গুপী পিছনের লোকটার পায়ে মারতে সে ছিটকে পড়েছে, তার উপর দুমদাম শব্দে আঘাত করছে গুপী।

মতিলাল ওর ভরাট নাটুকে গলায় চিৎকার করে—চোর—চোর! —চোওর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টর্চ, হ্যাজাক, লোকজন এসে পড়ে। ততক্ষণে ওই ফোর স্কোয়ারের ফেস্টুন-ফালা দিয়েই লোকদুটোকে আস্টেপিস্টে বেঁধে ফেলেছি। বাক্স দুটোও খুঁজে পাওয়া যায় হেজাকের আলোতে।

আদকমশাইও নিজে এসেছেন গোলমাল শুনে। দোতলার বারান্দা থেকে দড়িটা তখনও ঝুলছে। গহনার বাক্স দুটো দেখে চমকে ওঠেন তিনি। সর্বনাশ! এ যে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল ব্যাটারা!

আহত লোকদুটোকে আমরাই টেনে এনেছি। পুলিস অফিসার এসে অবাক হল—আরে, একটা তো দাগী ডাকাত! আর রহমৎ তো খুনের ফেরারী আসামী! তোমাদের এই কাজ?

লোকদুটো মারের চোটে ধুঁকছে। গুপী বলে—আরও দুঘা দিই স্যার।

বাধা দেন দারোগাবাবু—ঢের হয়েছে! আর থাক গুপীনাথ। উঃ! বিরাট একটা কেস ধরেছ তোমরা।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ক্যাপটেন পশুপতিবাবুকে ধড়াচূড়ো পরে আসতে দেখে আদকমশাই বলেন—আপনার ছেলেরা কি করে পশুপতিবাবু? ধড়াচূড়া পরে লুচি আলুর দমই খায় কেবল। দুটো লোক এদিক থেকে গিয়ে ভিতরের মহলে ঢুকে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছিল, দেখেনি?

ভিড় ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠি। চেনা যায় না হোঁৎকাদাকে। সেই লোকটা বোধহয় আচ্ছাসে মেরামত করে গেছে সেবাব্রতী হোঁৎকাদাকে। গালে প্লাস্টার, কপালে আব—গজিয়ে চোখ ঢেকে গেছে, বাঁ হাতটা গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা। খাকি শার্টটা ফেটে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জিও ঝুলছে। হোঁৎকাদা বলে ওঠে



আদকমশাইয়ের কথায়—আমার সেবাদলের ছেলেরা স্যার অন্য ধাতুতে গড়া। নিঃস্বার্থ সেবাই তাদের ব্রত। আপনারা চাননি, তবু ওরা নীরবে সেবা করে গেছে আপনাদের।

আদকমশাইও কথাটা স্বীকার করেন এবার।

তাই এবার ফোর স্কোয়ার ক্লাবের বার্ষিক উৎসব বেশ জাঁকিয়ে করছি। লৌহ-ভীম গুপীনাথের ফিজিক্যাল ফিটস্, পটলার কণ্ঠ-সংগীত, আর শ্রীমতিলালের পরিচালনায় নাটকও হচ্ছে। হোঁৎকাদা আপাততঃ ওই নিয়েই ব্যস্ত।

তোমাদেরও নেমতন্ন রইল।

---

www.arisumu.com

# হোঁৎকার দেবসেবা

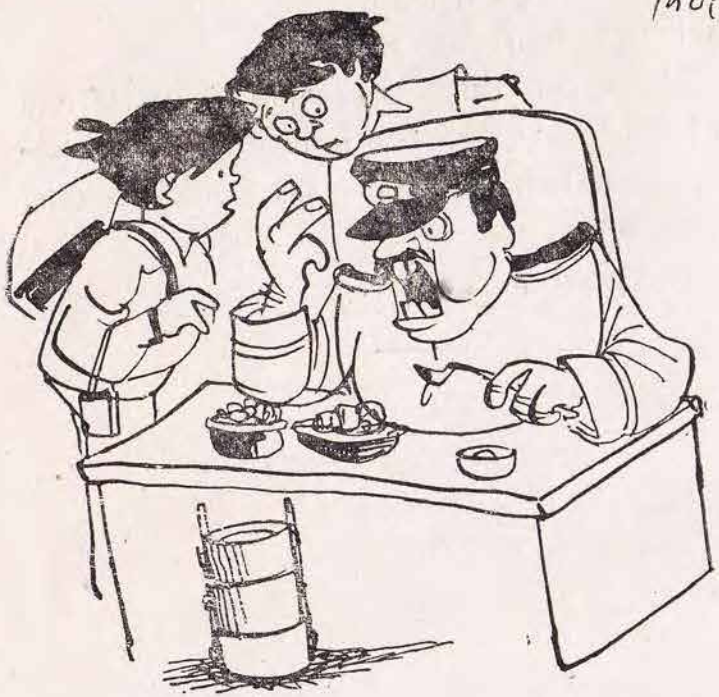

পটলাকে নিয়েই ফ্যাসাদে পড়ি আমরা। এমন দু'একজন আছে যারা সব সময়েই নিজেদের বুদ্ধির প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ে এক একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। আর বিচিত্র সে সব কাণ্ড।

পটলাও তেমনি গোছের। পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের বাকী চারটি, মামা আর ওই পটলাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে মনে হয় ওসব ঝকমারিতে যাবো না, রামচন্দ্র হেন অবতার বিশেষ ব্যক্তিও লক্ষ্মণের মত ভাইকে বর্জন করেছিলেন। সেদিন পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের জরুরী মিটিং-এ হোঁৎকাই বলেছিল।

—পটলার এগেনেষ্টে এস্‌টেপ্‌ নিতি হবে। কিন্তু ওর এগেনেষ্টে



এস্‌টেপ নেওয়াও যা ডালে বসে সেই ডাল কাটাও তাই। তাহলে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের অস্তিত্বই থাকবে না। পটলা আমাদের কামধেনু। ক্লাবের ঝালমুড়ি—চা নকুরের দোকানের চপ, কাটলেট, রামখেলাগুণের ফুচকা, কালুয়ার কুল্‌পি মালাই প্রভুতির বিল মেটায় সে। মাঝে মাঝে গ্রাণ্ড ফিষ্টও হয় তার দৌলতে; আউটিং অর্থাৎ দেশভ্রমণও হয়ে যায় তার সুবাদে। এ হেন পটলাকে হটানো যায় না চট্‌ করে।

ইদানীং অবশ্য ক্লাবের একটা জবরদখলী জায়গায় রীতিমত পাথর-নুড়ি সাজিয়ে তেলসিন্দুর মাখিয়ে একটা শিশু বটের চারা লাগিয়ে জল দিয়ে একটা মিনি মন্দির করা হয়েছে। ফটিক-এর বাবা এ পাড়ার নামী পূজারী বামুন, তস্যপুত্র ফটিক সেখানে ফি শনিবার শনিপূজোর পত্তন করেছে।

জায়গার মালিক সাহজীর বিরাট পুরানো লোহা-লক্করের কারবার, সে এসে দেখে জায়গা আর নেই এখন দেবস্থান। ফলে চেষ্টা করে ও আর উৎখাত করতে পারেনি। ইদানীং ফি শনিবার বেশ আমদানীও হয়। প্রণামী পড়ে। অবশ্য প্রণামী পড়াটা খানিকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। ওটাকে একবার সংক্রামিত করে দিতে হয়। চালু হয়ে গেলে প্রণামী তখন আপনা হতেই পড়ে।

শনিবার বড় পিতলের থালায় ফটিক আগেকার সঞ্চিত কিছু দশ নয়া—পাঁচ নয়া—দু চারটে সিকি ফেলে রাখে, মাঝে মাঝে আমরাও কিছু ফেলি, দেখাদেখি পথচারীরাও ফেলতে থাকে রাত্রিতে। পূজোর যখন হিসাব হয় দেখা যায় শশা বাতাসা কলার ঘটা খরচ দিয়েও বেশ কিছু থাকছে।

হোঁৎকা বলে—শনি ঠাকুর খুব জাগ্রত দেবতা। তয় মন্দির একখান্‌ বানাতি লাগবে।

আমি অবাক হই সে তো অনেক কাণ্ড। ফটিক বেশ ঝকঝকে পাথর বাঁধানো মন্দিরের স্বপ্ন দেখছে, সে বলে বাবার কৃপায় হয়ে যাবে

রে! আর ওদিকে গানের ক্লাশ খুলে ভজন টজনও শেখানো হবে।

ফটিক গানও গায়, কি যে গায় বুঝি না—তবে গলা ফাটানো চীৎকার প্রায়ই শুনি। পটলাকেও দিনকতক তালিম দেবার চেষ্টা করেছিল। পটলার ও মাঝে গাইয়ে হবার সখ চেপেছিল, কিন্তু ওর জিভটা মাঝে মাঝে টাকরায় আটকে গিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড বাধে, সেবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বসেছিল কুলেপাড়ার ফাংসনে। বেশ মানজা দিয়ে বসে সবে গান ধরেছে—তুমি কেমন ক্ করেগান ক্ রোহে গু ব্যস তারপরই ব্রেক ফেলে করে 'গুণী' অবধি আর পৌঁছতে পারে নি গু-গু-গু—

বারকতক পবিত্র আসরে ওই অপবিত্র নোংরা ব্যাপারটার কথা এক নাগাড়ে বলে যেতে পাবলিক ঘোর প্রতিবাদ করে তাকে উঠিয়ে দিল, কোন বেরসিক পাবলিক পচা টমেটোও ছুঁড়ে দেয়, ফলে কাজকরা ওর পাঞ্জাবিটা রঞ্জিত হয়ে ওঠে। সে এক কাণ্ড।

সেই থেকে পটলা ফটিকের কাছে ন্যাড়া বেঁধে রীতিমত কালোয়াতি গান শিখতে থাকে। ওতে ভাষা টাষার বিশেষ ঝকমারি নেই।

পটলাও বলে—ত—তা মন্দ হয় না। গোবরা বলে—তাহলে ডোনেশন তুলতে হবে, না হয় একটা যাত্রা গান লাগিয়ে দে মন্দির নির্মাণ কল্পে ষ্টাম্প দিয়ে পোষ্টার করে। গোবরা যাত্রার দলের খুব ভক্ত। ক্লাবের থিয়েটারে রাজপুত্র, নায়ক টায়কের পার্ট করে।

হোঁৎকা বলে—এপিমেট কইরা আনছি। কি করে পটলা—মন্দির হইবো? পটলা আমাদের শেষ আশ্রয়। মন্দির, বিদ্যালয়—সঙ্গীত কলালয়টয় করবে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব—। পাড়াতেও এর মধ্যে খবর ছড়িয়ে যায়।

কুলেপাড়ার ক্লাবের ছেলেদের হিংসে ছিলই আমরা দিব্যি কায়দা করে জায়গা—মিনিমন্দির শনিপূজা করে ক্লাবের আমদানী বাড়িয়ে এবার বিদ্যালয়-টিদ্যালয় গড়ার কথা ভাবছি, তারা ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে—ওসব ফোরটোয়েনটি ব্যাপার।



এই নিয়ে সেদিন গোলকবাবুর রকে হোঁৎকা—ওদের সঙ্গে দুচারটে কথা কাটাকাটি করে। পটলাও ছিল। তারও প্রেষ্টিজে বাধে, অবশ্য কথা বেশী বলতে পারে নি সে। জিবটা ব্রেক ফেল করেছিল।

তবু বলে সে—সিওর হবে বি-বিদ্যালয় মন্দির! ওরা বলে—ছাখা আছে। ফোরটোয়েনটি করে জায়গা দখল করেছিস, লোক ঠকাচ্ছিস পূজোর নামে।

আমাদের ক্লাবের চত্বরে রীতিমত আলোচনা হয়। আমি বলি ছেড়ে দে ওদের কথা। আর ওসব করাও অনেক খরচার ব্যাপার।

হোঁৎকা বলে—ওল্ড কজ, এর জন্যে ডোর টু ডোর ভিক্ষা করুম? গোবরা বলে—কৌটা নাচাতে পারবো না? ওতে আমি নাই।

মন্দির তাহলে হবেনা। পটলাই আবার সেই ঝামেলা বাধিয়েছে। সে ওদের সামনে ঘোষণা করেছে—ওসব সিওর হবে।

ক'দিন চুপচাপই থাকি—হঠাৎ সেদিন পটলা, যেন খুশীতে বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উড়ে এসে পড়ে বলে সে।

—লা-লাইন কি-কিলিয়ার? মন্দির হবে সিওর। হোঁৎকা চুপসে গেছল। ফটিক তো আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। কেবল কণিষ্ক জোর মন্তর আওড়ায়। গোবরা বিরসবদনে বসে থাকে। পটলার কথা শুনে হোঁৎকা বলে দেশজ ভাষায়।

—ইস্টপ! চুপ কর পটলা! আমাগোর গাছে তুইলা মই কাড়ছিস তুই? তর লগে নো কনেকশন্।

আমরা অবাক হই। পটলা বলে।

—ফটিক, ঝালমুড়ি নিয়ে আয়। আর ম-মন্দিরের ব্যাপার ও স্—স—

আমি বলি—ষ্টপ হয়ে গেল? পটলা এবার মরীয়া হয়ে বলে—নো! সেটেলড্। প-পাক্কা। ম-মন্দির হবে? ইউথ বি-বিদ্যালয়। পিসীমা রাজী—

ফটিক জয়ধ্বনি দেয়—জয় বাবা শনিমহারাজ। সবই তোমার কৃপা।

পরে শুনে খেয়াল হয় তার। বলে সে।

—সুখবর শুনে ঝালমুড়ি স্রেফ—কি রে হোঁৎকা?

হোঁৎকা বলে—যা রতনের দোকান থেকে গরম সিঙ্গাড়া আর টু পিস্ কইরা নলেনগুড়ের সন্দেশ আন্। সাথে চাও আনবি। প্যাট ঠাণ্ডা কইরা সব ভাবতি হইব।

পটলার এক পিসীমা থাকেন মেমারিতে। নেমে মাইল দশেক ভিতরে কোনও গ্রামে। বিরাট জমি জায়গার মালিক—আলু হয় পাহাড় প্রমাণ, নিজেদের কোল্ড ষ্টোরেজও আছে। বিরাট দিঘিও কয়েকটা। মাছ বিক্রী হয় বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার মত।

টাকার নাকি হিসেব নেই। পিসেমশাই মাটির মানুষ পিসীমাই সব। আর খুব ভক্তিমতী তিনি। এর আগে গুরুদেবের মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন, বৃন্দাবনের মঠে যতো চাল আলু লাগে তামাম সাপ্লাই করেন। তিনি নাকি আশা দিয়েছেন পটলাকে—এসব করে দেবেন।

হোঁৎকা বলে—তর যাবার লাগবো। প্ল্যান-হিসাবপত্র লইয়া চল গিয়া হেই পিসীমার কাছে।

ফটিক এহেন মৌকা ছাড়তে রাজী নয়।

সে বলে—শুভস্চ্য শীঘ্রম। মঙ্গলে উষা বুধে পা, আজই চল তাহলে ফিরে এসে জোর করে মহারাজের পূজো দেব।

...ইদানীং শনিমহারাজের ভক্ত হয়ে উঠেছে ফটিক। বেলপাতায় সিন্দুর তেল এর পেষ্ট—কাপালেও কিছুটা লাগিয়েছে সে। আমরা পঞ্চ পাণ্ডব চলেছি মেমারির দিকে।

ইষ্টিশনে নেমে বাস মেলে, বরাত ভালো থাকলে টাক্সি ও মিলবে। তবু শোশাই

—ইষ্টিশান থেকে এত দূর, অচেনা জায়গা—রাত হয়ে যাবে, কাল সকালেই চল—



হোঁৎকা গর্জে ওঠে—কাওয়ার্ড! একটুকু পথ—হোঁৎকার হঠাৎ মনে পড়ে ভাবার্থ সম্প্রসারনের একটা কবিটা কবিতা বলে সে।

—ক্যান্ পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ্, তারপরেই যথারীতি ভুলে গেছে। বলতে—পারটা কি র‍্যা? পটলা সুর করে-উত্তম বি-বি—হনে ক্ ক্—

বাস তখন কুলেপাড়া ছাড়িয়ে শিয়ালদা চত্বরে এসে গেছে। আমার প্রপোজাল ওরা ভেবে ও দেখলনা, পটলার কবিতা তখন ও হয়নি।

হোঁৎকা অউড়ে দেয়—নাম! বলি হাওড়া থেকে মেমারি হোঁৎকা বলে—কথা কবিনা! নো টক্! শিয়ালদাহ ওই নৈহাটি দিয়া ব্যাণ্ডেল গিয়া ট্রেন ধরুম।

বৈকাল তখন হয় হয়! আষাঢ় মাসের দিন একটু বড়ই হয়। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে নেমেছি তখনও বেলা একটু আছে। বর্ষায় মেঘগুলো ঘুরছে আকাশে, চারিদিকে মেঘভাঙ্গা রোদ মাঝে মাঝে উঁকি মারে। আবার ঢেকে যায় মেঘের আড়ালে সূর্যের আলোটুকু।

মেমারি যাবার গাড়ির দেরি আছে। এদিকের প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে আছি, হোঁৎকা বলে।—ফটিক! চা বিস্কুট আন গিয়া, আর এহানের কলা ও ফাস্কেলাস! কিছু লইয়া আয় গিয়া।

মন দিয়ে কলা খাচ্ছি, পটলা বলে,—রাতে গিয়ে পি-পিসিমার পু-পুকুরের তাজা রুই মাছ এর ঝোলদিয়া গ-গোবিন্দ ভোগ চালের ভাত।

খিদেও লেগেছে। রুই মাছের মুড়িঘন্ট—কালিয়া দিয়ে সুগন্ধী গোবিন্দভোগ চালের অন্ন-বাড়ির ঘৃত সহযোগে—কথাটা ভাবতে জিবে জল আসে। আর আশা আছে মন্দির বিত্তালয় তৈরী হবে।

গাড়ি আসছে। বর্দ্ধমান লোক্যাল—ট্রেনে উঠতে যাবো হঠাৎ পটলার চীৎকার শুনে চাইলাম। বেঞ্চের উপর ব্যাগটা ছিল—তাতে আমাদের জামা—প্যাণ্ট, টাকা পয়সা মায়, ট্রেনের টিকিট ও ছিল, সবশুদ্ধ ব্যাগটাই হাওয়া হয়ে গেছে।

ব্যাণ্ডেল জংশন-এর এত মহিমা জানা ছিল না। এখানের চোরদের শিক্ষা কলকাতার চোরদের চেয়ে কোন অংশের কম নয়। ওরা তাক্ বুঝে ঠিক মাল হাপিস্ করেছে। ওদিকে ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে।

হোঁৎকা উঠে পড়েছে ট্রেনে—ওকে নিয়েই বোধহয় ট্রেন চলে যাবে। পটলা ওকে কি বলবে চেষ্টা করে। বোধহয় নেমে আশতেই বলছে, কিন্তু জিবটা ঠিক সময়েই বিট্রে করে টাকরায় সেঁটে গেছে।

পটলা তখন ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠেছে ওকে নামাবার জন্যই। আমরা ও ফলো করেছি ট্রেনের কামরার মধ্যে। ইলেকট্রিক ট্রেনটা সিটি বাজিয়ে ফুলস্পিডে ষ্টেশন প্লাটফর্ম ছেড়ে বের হয়ে গেছে।

নামার কোন পথই নাই। পটলা বলে কোনমতে স-সবোনাশ হয়ে গেছে। ব-ব্যাগটা কে নিয়ে গেল।

আমরা ভাবছি। হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তরে এ্যাক্ লাথি মাইরা ফ্যাইলা দিমু ট্রেন থেকে। ম্যাডাগাস্কার কোথাকার। এহন—

পটলা শান্তনা দেয়—পিসীমার ওখানে পৌঁছিলে স-সব ম্যানেজ হবে যাবে।

পাঁচজনের পকেট এর আবস্থা নিদারুণ ভাবে শূন্য। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মোট সাড়ে চার টাকা একস্ট্রা ছিল, তাই বেরুলো।

পটলা বলে—বাস ভাড়া হয়ে যাবে। তারপর পিসীমার ওখানে স-সব পাবি।

আমি বলি—ট্রেনে যদি ধরে?

হোঁৎকা ক্রমশঃ ভেবেচিন্তে পথ করেছে। বলে সে।

—এ ট্রেনে চেক্ হইবনা। চলগিয়া। ট্রেন তখনও দুদিকের সবুজ পাটক্ষেত—সদ্য কার্ত্তিক ধানক্ষেতের বুকে-চিরে চলছে। সন্ধ্যা নামছে—মেঘঢাকা আকাশ ছেয়ে এবার বৃষ্টি নেমেছে অঝোর বৃষ্টি।

—টিকিট? যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। টিকিট নেই আর এই সময় কিনা হানা দিয়েছে টিকিট চেকার। হোঁৎকা বলে।



—ছিল স্যার? টিকিট চেকার পাঁচজনকে দেখছে। ফটিকের কপালে সিন্দুরের দাগ, পরনে গেরুয়া ধুতি—পাঞ্জাবী। ইদানীং শনিমহারাজের রেগুলার পুজো করে ও আধা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে—তাছাড়া পিসীমাকে মন্দির টন্দিরের কাজে নামাতে হবে তাই ফটিক এমনি জব্বর মেক্আপ্ নিয়ে বসেছে। টিকিট চেকার গুতোয়। —টিকিট ছিল তা গেল কোথায়? কি হে ছোকরা—তোমাদের মত টিকটের কি ডানা পালক গজিয়েছিল? এ্যাঁ—

পটলা বলে—চ-চ-চ টিকিটচেকার গর্জে ওঠে—আবার ভেংচানো হচ্ছে? টিকিট বের করো—নাহলে সিধে রেলওয়ে পুলিশের গারদেই পুরে দেব বর্দ্ধমানে।

কোন যাত্রী বলে।—দেখে তো ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। অন্যজন বলে—পকেট সার্চ করুন দাদা, ট্রেন ডাকাতির মতলবে ঘুরছে কিনা? ছুরি—ভোজালি—বম—পিস্তল না বেরুয়।

হোঁৎকা বলে—বিশ্বাস করুন চোর আমরা নই, চোরেই আমাগোর সব লইয়া গেছে ব্যাণ্ডেল ইষ্টিশানে।

টিকিটচেকার গর্জে ওঠে ব্যাণ্ডেল ইষ্টিশানের চোরদের এহেন অপবাদ শুনে। ধমকে ওঠে সে।

—মিথ্যে কথা। নিজেরাই চোর কিনা ঠিক নেই আবার ব্যাণ্ডেলের বদনাম দিচ্ছ। লজ্জা করেনা। আমিও ব্যাণ্ডেলে থাকি।

সামনে ষ্টেশন আসছে। টিকিট চেকার বলেন। —নামো এখানেই। চলো—নাহলে বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেব।

কে বলে—তাই করুণ দাদা। নাহলে ডব্লু-টির যাত্রীদের সিধে করা যাবে না।

ষ্টেশনে গাড়ি থামতে চেকার সাহেব আমাদের টেনে নামিয়ে এবার বলে—কি আছে বের করো?

হোঁৎকা বলে—ছোরা পিস্তল নেই স্যার। পটলা বলে—বি-বিলিভ মি স্যার-চোর নই।

চেকার সাহেব বলে—ওসব না, টাকা কি আছে বের করো জলদি। নাহলে—

ফটিক আমাদের সমবেত ফাণ্ডের চারটাকা পঞ্চাশ পয়সা বের করতেই ব্যাণ্ডেলের চেকার সাহেব ঘপ্ করে সব কটা টাকা পয়সা হাতের মুঠোয় পুরে ধাবমান ট্রেনে উঠে পড়ে, চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা কর্তব্যপরায়ণ চেকারকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

হোঁৎকা এবার ব্যাপার বুঝে গর্জন করে!—হালা ব্যাণ্ডেলের চোর ও য্যামন—চেকার ও তেমনি। তুইডাই এক কেলাসের। লাষ্টপাই অবধি নিয়া গ্যালো গিয়া। তবু ঠাকুরের কৃপা, যেখানে নামিয়েছে সেইটাই মেমারি ইষ্টিশান।

পটলা বলে—তবু এখানেই এসেছি। হোঁৎকা গর্জায়—স্বর্গে আইছি! চা খাবার পয়সাও নাই—দশমাইল কইছিস, বাস ভাড়াও নাই। যামু ক্যামনে?

ভাবার কথা। রাত্রি হয়ে আসছে। ষ্টেশনের বাইরে এসে দেখি মল্লিকপুরের স্টেটবাস তখন চলেছে, কাদা ভরা রাস্তা—বাস-এর সর্বাঙ্গে মানুষ। ছাদে বসে ও কাজভেজা হয়ে ভিজছে লোকজন। কণ্ডাক্টার হাঁকছে।

লাষ্ট বাস মল্লিকপুর কুসুমগাঁ! খালি গাড়ি বোঝাই বাসটা টলতে টলতে বের হয়ে গেল। আমরা পথে দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা এগারোটায় বাড়িতে ভাত খেয়ে ক্লাবে এসে দল বেঁধে বের হয়েছি। ব্যাণ্ডেলের কলা পাউরুটি কখন হজম হয়ে গেছে মানসিক, দৈহিক ধকলে। এবার বুঝতে পারি খিদের জ্বালাটা।

হোঁৎকার খিদে পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। অচেনা জায়গা সঙ্গে টাকা পয়সাও নেই। ওদিকে দোকানের শোকেসে কদ্‌বেলের সাইজ রাজভোগ, সন্দেশ, কালো ঘৃতপক্ক ল্যাংচা রসে হাবুডুবু খেয়ে যেন ডাকাডাকি করছে, বাদলার রাতে গরম আলুর চপের খদ্দেরের অভাব নেই। আমাদের পেটের নাড়িগুলো পাক দিচ্ছে খিদের জ্বালায়।



পটলাই বারবার এমনি সব দারুণ দারুণ বিপদে ফেলে। আর প্রত্যেকবারই বলি তোর সঙ্গে আর নেই। কিন্তু বরাত দোষে ও জুটবেই আর ফ্যাসাদে ফেলবে। তবু পটলা সান্ত্বনা দেয়।

—পিসীমাকে চিঠি দিইছি। গরম খিচুড়ি-মাছভাজা মাছের কালিয়া—হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তরেই কালিয়া বানাইমু পটলা! এহন দশমাইল পথ যামু ক্যামনে! উঃ ক্ষুধায় চক্ষে অন্ধকারে দেহিরে! শেষ মার মাইরা গেল ব্যাণ্ডেলের চেকার? খাসা জায়গাখান্—হালায় জামা প্যাণ্টুল সব লই গেল—যামু ক্যামনে তর মল্লিকপুর!

এমন সময় সিটকে মত ছেলেটা এগিয়ে আসে!—মল্লিকপুর যাবেন ট্যাক্সিতে—

বাসের ভাড়া নাই আর ট্যাক্সিতে চাপবে? পটলা বলে মল্লিকপুর চৌধুরীদের বাড়ি যাবে।

ছোঁড়াটা বলে বেশতো চলেন। পাঁচজনে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। তুমাইল রাস্তা কিনা—বর্ষার রাত!

আমি শোনাই—পটলা! টাকার কি হবে?

পটলা অভয় দেয়—পিসীমার বাড়ি যাচ্ছি—পৌঁছলে নো ফিয়ার। ওখান থেকেই পিসীমা সব ম-ম্যানেজ করে দেবে।

তবু দরাদরি করে রফা হ'ল তিরিশ টাকায়।

শুধোয় গাড়ি কোথায় তোমার?

ছেলেটা দেখায়—ওই তো!

দূরে দেখি একটা যেন মানুষের স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ক্যাম্বিসের ছাদটা পিছনে ফেলা। সাবেকী আমলের হুডওয়ালা গাড়ি হুডটা নাই, মুক্ত আকাশের নীচে তুটো সিটে জনা চৌদ্দ মানুষ অলরেডি জড়াজড়ি করে আছে, পাদানিতে তুদিকে তুটো বাঁশ ফিট করা, তাতে তুপাশে ব্যালেন্স করে জনা আষ্টেক ঝুলছে পাদানীতে ঠ্যাং রেখে।

ছোড়াটা সামনে কুণ্ডলীভূত ড্রাইভারকে শোনায়। মল্লিকপুরের পাঁচখান মাল পেইছি, ড্রাইভার বলে—পেছনে সেঁটে দে!

আর কোন উপায় নেই। পেছনে হুড-এর উপর জালে রাখা মাছ-এর মত বসেছি। ছেলেটা বলে।—পথে সব খালি হয়ে যাবে তখন সিট্ পাবেন। এখন চলেন—

বিচিত্র বাহন এবার নেচে কুঁদে হেলেদুলে চলেছে, আমরা হুডের ক্যানভাসের ফাঁকে উল্‌টি পাল্‌টি খেতে খেতে চলেছি তপ্ত খোলাই ভাজা খই-এর মত অবস্থা আমাদের। হোঁৎকা গজগজ করে, কি বিপদেই না পড়েছি—হালায় শনি ঠাকুরের মন্দিরের কাম নাই, থাউক বিদ্যালয়ের কতা—নাইমা পড়।

নামবার উপায়ও নাই। পয়সা কিছুও দিতে হবে তাহলে, তাও নেই। পটলা বলে—ম-মল্লিকপুর অবধি যে যেতেই হবে।

হোঁৎকা কাতরস্বরে জানায় ডেডবডি খান্ ই লইয়া যাবি মনে লয়। হুডএর ভাঁজ করা লোহার রডের মধ্যে পড়ে আমি চাপা খেয়ে কাতর স্বরে আর্তনাদ করছি। ড্রাইভার গর্জন করে চুপ করে থাকুন।

গাড়ি লম্ফ দিয়ে যেতে যেতে এবার থেমেছে কোন গ্রামের ধারে। হঠাৎ পথের ধারে চায়ের দোকানে হ্যাসাক নিয়ে কারা অপেক্ষা করছিল।

সমবেতভাবে চিৎকার করে—এসে গেছে। ঢোল কাঁসিও বেজে ওঠে। গাড়ির ওই মানুষের পিণ্ডগুলো বরযাত্রীর দল, বরও ছিল তাতে। গুণেগুণে দেখি তেইশজন উইথ বর নামল গাড়িখানা থেকে।

ফটিক বলে—উঃ! বিয়ে বাড়ির খাওয়াও জোর হবে। এদের সঙ্গেই নামবি নাকি?

বুদ্ধিটা ভালোই, কিন্তু টাকা কই! আমরা যেন পোষ্টাপিসের ভিপিতে চলেছি। ঠিকানায় পৌঁছে টাকা দিলে তবে ছাড়া পাবো। নাহলে ছাড়া পাবার উপায়ও নেই। পটলার পাল্লায় পড়ে আবার কি ঘটে কে জানে।

—সিট এ বসেন। গাড়ি খালি হয়ে গেছে। এবার আরাম করে সিটে বসেছি। বর বরযাত্রীরাও চলে গেছে। আঁধার নেমেছে, পিটি পিটি বৃষ্টি বন্ধ ছিল আবার পড়তে শুরু করে।



আমি বলি—গাড়ির হুডটা টেনে দেবেন? হেলপার ছেলেটা বলে—হাওয়ায় ইস্‌পিড কমে যাবে লাগালে। কি গো গন্নুদা লাগাবো?

—না!

শুধোই—মল্লিকপুর আর কতদূর?

ড্রাইভার ছোটকথা কানে তোলে না, হেলপার ছেলেটা—সিগ্রেট আছে? দাও না একটা।

জানাই ওসব খাইমা। ছেলেটা গুম হয়ে যায়, মল্লিকপুরের হদিশও জানায় না রেগে মেগে। নির্জন মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলেছে লম্ফ ঝম্প করে।

এবার পিচরাস্তা শেষ হয়ে খোয়াকেলা আধকাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। বৃষ্টির মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ ও উঠেছে। মনে হয় মল্লিক-পুরের কাছে এসে গেছি। রাতে ভরপেট মাছের ঝোল ভাত পাবো। বিছানা পাবো। ঘুম যা হবে ভাবতেই চোখবুজে আসে আরামে।

হঠাৎ গাড়িটা ঝড়াং করে থেমে গেল। ড্রাইভার গাড়িতে বসেই বলে—গাড়ি আর যাবেনা। ওই গ্রামটার ওপারে মল্লিকপুর। হেঁটে চলে যান। রাস্তা খারাপ—বিলে এদের পয়ত্রিশ ট্যাকা না—

ঘুম ছুটে গেছে। এবার হোঁৎকা নিজমূর্তি ধরেছে। বলে সে—মল্লিকপুর লই যাবা কইছো—তয় গাড়িতে উঠছি। এহন মাঝপথে কও যাবে না রসিকতা পাইছ?

ড্রাইভারও গর্জে ওঠে—বল্লামতো রাস্তা খারাপ। আমি বলি—সঙ্গে টাকা নাই। মল্লিকপুর চৌধুরী বাড়ি গেলে তবে ভাড়া পাবে।

ড্রাইভার এবার হুঙ্কার ছাড়ে—ভাড়া দেবে না? বিলে ছোঁড়াটা ফস্‌করে গাড়ির হ্যাণ্ডেল বের করেছে। ড্রাইভার গজরায়।—ভাড়া না দিলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। দেও টাকা।

—টাকা সত্যিই নাই?

ড্রাইভার হুঙ্কার ছাড়ে—নামার বাড়ি পেয়েছো?

পটলা আন্তরিক ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে—পি-পিসার ব-ব—

—চোপ! ড্রাইভার ওকে এক ধাক্কা দিতে পটলা ছিটকে পড়ে রাস্তায়। ওরা দুজন আমরা পাঁচজন। হোঁৎকা ও গর্জে ওঠে—শ্যাষ কইরা দিমু। কইছি ট্যাকা সাথে নাই।

সেই-ই এবার রডটা হাতিয়েছে। হেলপার ছোঁড়টা কুঁই কাই করছে। ড্রাইভার বলে—এতখানি তেল পুড়িয়েছি, কিছু দ্যান। না হয় ঘড়িটাই দিতে হবে।

পটলা এক পটকান্ খেয়েই টের পেয়েছে ব্যাপারটা। এবার দুই পক্ষই যুদ্ধমান। হেলপার বিলে সিটের নীচে থেকে এবার হাঁসুয়া বের করেছে। আমিও ঘাবড়ে যাই। কে জানে হাসুয়া চালাবে কিনা।

পটলার জন্মদিনের উপহার এইচ-এম-টি ঘড়িটা খুলেই ওকে বলে। —এইটা ও নাও? থ্-থামদিকি তোরা।

ড্রারভার এত সহজে দাবীর চেয়ে বেশী আদায় হতে দেখে গাড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করছে, সরু রাস্তা। দুদিকে নীচু খাদ—

হঠাৎ একটা কলরব শুনে চাইলাম। ওদিকের গ্রামের দিক থেকে কয়েকটা টর্চের আলো পড়ে। কলরব উঠছে কারা অন্ধকারে ছায়া-মূর্তির মত দৌড়চ্ছে—দু'একটা বোমের শব্দ ওঠে।

—ডাকাত! ডাকাত!.....

গ্রামে বোধহয় ডাকাত পড়েছিল। তাড়া করেছে ওদের গ্রামের লোকজন। হঠাৎ পথের উপর জনা দশেক ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে, গাড়িটার দিকে। অবাক হই ড্রাইভার দু'একবার সাইড লাইটটা জেলে কিসের সংকেত করছে। আমাদের বলে সে।—চলে যাও, ওদিকে। ওই আলপথ ধরে। যাও বলছি।

ছায়ামূর্তির দল একজন আহত রক্তাক্ত লোককে ধরাধরি করে এনে গাড়িতে তোলে। আমাদের দেখে গর্জে ওঠে একজন। ভোজালি তুলে তেড়ে আসে—ফিনিশ্ করে দেব। চল গজা—ওরা আমাদের ফেলেই গাড়ি হাঁকিয়ে পালাতে চায়। মনে হয় গাড়িটা গজা এখানেই



আনতো এদের নিয়ে যাবার জন্য। পথে কিছু দমকা রোজগার করেছে মাত্র।

এবার বেশ মোটা মাল রোজগার করেই ফিরছে। একটা সুটকেশ —বস্তায় জড়ানো কি সব, হাতে অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। বাধ্যহয়েই সরে গেছি আমরা ওদিকে।

গাড়িটা ষ্টার্ট করেই চীৎকার করে ওঠে ড্রাইভার। গাড়ি নড়েনা। ষ্টিম ইঞ্জিন গজরাচ্ছে কিন্তু গাড়ি চলেনা। ওরা নেমে পড়েছে দু'এক-জন, চমকে ওঠে ড্রাইভার।

হোঁৎকাও তৈরী। সে বলে—শালারা ডাকাত, ওই গাড়ির তিনটে চাকার হাওয়া আমিই খুইলা দিছি-হালায় শয়তানিটা দেখ এবার।

লোকগুলো বিপদে পড়েছে। আমরাও চীৎকার করছি—ডাকাত! ডাকাত! হুঁসিয়ার—!

গ্রামের লোকজন ভাবেনি যে ডাকাতরা এখানে আছে। আমাদের চীৎকার শুনে তারাও দৌড়ে আসে। ডাকাতরাও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে—তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তাদের। দু'একজন গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে পালাতে যাবে সেই কেড়ে নেওয়া হ্যাণ্ডেল হাতে হোঁৎকা দুই ঘায়ে দুটোকে কাদায় ফেলেছে, ওদিকে এসে পড়েছে গ্রামের লোকজনও। পলায়মান ড্রাইভার এর লম্বা চুলের মুঠো ধরেছে গোবরা; কয়েক মিনিটের মধ্যে লড়াই শেষ। সারা গ্রাম যেন ভেঙ্গে পড়েছে, ডাকাতরা হানা দিয়েছিল পটলার পিসীমার বাড়িতেই। সেনো দানা—টাকা কড়ি মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর নিয়ে পালাচ্ছিল, আর পড়বি তো পড় আমাদের সামনেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রামের শ খানেক জনতা এসে ডাকাত-ড্রাইভারদের ধরে ফেলে, দু তিনজন বেশ আহতই। থানার দারোগাও এসে পড়েন পুলিশ বাহিনী নিয়ে।

পিসেমশাই অবাক হন পটলাকে দেখে, সেও কমবেশী ঝাড়

খেয়েছে মরীয়া ডাকাতদের হাতে। কপালটা ফুলেগেছে জামাটা ফর্দাফাই। হোঁৎকা রেগেছিল ব্যাণ্ডেল থেকেই চোর নামক প্রাণীদের উপর, শেষ ঘা মেরে গেছে ব্যাণ্ডেলের চেকার, আর সর্বশেষ ঘা মেরেছে ড্রাইভার। পটলার ঘড়ি কেড়ে মিয়েছে। সব রাগ সে ঝেড়েছে ওই ডাকাতদের উপর তাদেরই গাড়ির হ্যাণ্ডেল দিয়ে।

পিসেমশাই বলেন—পটলা। তোরা এসে পড়েছিলি তাই এসব রক্ষা হ'ল রে। চল বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি চল। মল্লিকপুরের বাকী পথটুকু আর কষ্ট করে যেতে হয়নি। ওরাই শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেল।

চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। এতদিন ধরে আশপাশের গ্রামে, এই এলাকায় এরাই ডাকাতি করছিল, এবার জালে পড়েছে।

ফটিক বলে—সবই শনিমহারাজের ইচ্ছে বুঝলি। পিসীমাও ভক্তিগদগদ চিত্তে বলেন—সত্যিই রে। দেখছি এবার কি করা যায় তোদের ইস্কুলের জন্যে, মন্দির ও তৈরি করিয়ে দেব বাবার ?

হোঁৎকার সময় নেই। সে বলে।—এ্যাহন খ্যতি ছ্যান পিসীমা। বাবার কাম বাবায় বোঝবো। ক্ষুধায় এহন জ্বলতিছি।

হোঁৎকার ওই এক চিন্তা। গঠনমূলক কাজ—যে ব্যাটারা করবে তার দিকে নজর নাই, খাওয়াটাই বড়।

——



## পটলার বনভোজন

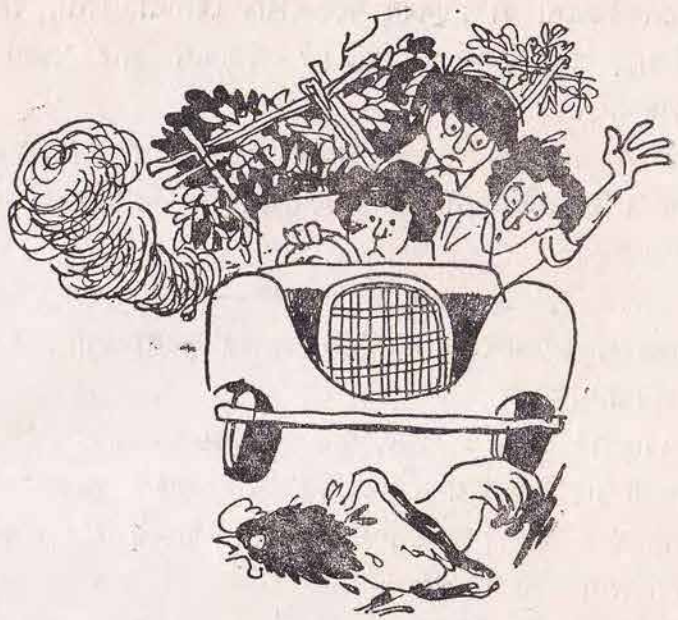

পটলা ইদানীং বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। অবশ্য পটলা নালায়েক কোনদিনই ছিল না, তবে আজকাল একটু বেশী রকম চালু হয়ে উঠেছে।

ধ্যাড়ধেড়ে সাইকেল ছেড়ে এখন মাঝে মাঝে ওর বাবার বাতিল সেকালের অস্টিন গাড়িটা চালাবার চেষ্ট করে। ওদের নতুন বাড়ির দিকে এখনও ফাঁকা মাঠ, পথঘাট পড়ে আছে। আমরা 'পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব'ও সেই মাঠে খুঁটি পুঁতে খানিকটা জায়গায় হোগলার ঘর বানিয়ে একটা পতাকা তুলে ফেস্টুন লাগিয়ে জবর দখল করে ক্লাব করেছি।

অবশ্য এই নিয়ে তিন বার আমাদের ক্লাবকে রিফুইজি হতে হয়েছে। মালিক এসে হম্বিতম্বি করেছেন, আমরা হোগলার চালা মাথায় করে অন্যত্র এসে খুঁটি পুঁতেছি, শেষকালের মালিক অবশ্য তিনশো টাকা

দিয়েছিলেন, কারণ ইদানীং ক্লাবের সভ্যসংখ্যা বেড়েছে, পাড়ার ছেলেদের চটাতে চায় না কেউ।

সেই তিনশো টাকা মূলধন করে আবার হোগলার চালা, বাঁশ, খুঁটি ঘাড়ে করে রিফুইজি হয়ে গেছি। ফটিক বলে—আর 'কেলাবে' দরকার নাই।

পটলা হোগলার ভ্রাম্যমাণ চালায় কাঁধ দিয়ে শ্মশানযাত্রীর মত আসছিল গুটিগুটি বিরস বদনে। সে বলে ওঠে—নেভার। ক—ক্লাবঘর চাই।

হোঁৎকা আমাদের দলপতি, সে বলে—আলবৎ হইবো। ওই পুকুরের পাড়েই নামা বাঁশ খুঁটি—চালাঘর তুইলা ফ্যাল, আমি একখান প্ল্যান করছি।

হোঁৎকার দেহটাও বিরাট, আর বদ বুদ্ধিও কম নয়। হোঁৎকা এর মধ্যে পাড়ার জয়লক্ষ্মী বিলডার্সের নোটন সাহার আড়ত থেকে ঠেলাগাড়িতে করে কিছু জলদাগি ইট-বালি-সিমেণ্ট এনে বলে—গাঁইথা ফ্যাল ঢিবির মত কইরা!

আমরা শুধোই—কি হবে এতে?

হোঁৎকা তখন কোত্থেকে গোটা পাঁচ-সাত কালো পাথর এনে হাজির করেছে। বলে সে—যা কইতাছি কর! তোগোর মাথায় আছে শুধু 'কাউডাং'—গোবর!

আমরা যো সো করে খানিকটা চাতাল মত করেছি। ন্যাড়া কোথা থেকে খানিকটা তেল সিন্দুর আর পরিত্যক্ত মন্দির থেকে মরচে পড়া ত্রিশূল একটা এনে জম্পেস করে পুঁতে দিয়ে নুড়িগুলোকে প্লেস করে বলে—হালায় পার্মানেণ্ট দেবস্থান বানাই দিলাম, ক্লাব আর দেবস্থান। কেডা এবার নড়ায় দেহি! বুঝলি—পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের এ্যাতদিনি একটা ডেরা হইল। এখন একখান বট আর অশথ গাছ আইনা পুতুম। কমপ্লিট—

ফটিক মাঝে মাঝে পুজো-টুজো করে। সেও মহাখুশি—হ্যাঁ।



কাজ করেছিস বটে হোঁৎকা। আগে করলে এ ভাবে রিফুইজি হতে হতো না রে।

পরদিন শনিবার। মাইক ভাড়া করে ফটিকই সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে ঘোষণায় বের হলো। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের উদ্যোগে গ্রহরাজ পূজা—ভক্তবৃন্দ দলে দলে যোগ দিন!

গ্রহরাজের যে এত ভক্ত ছিল, জানা ছিল না। লাল নীল কাগজ দিয়ে ক্লাব-মাঠকে সাজিয়ে সকাল থেকে মাইকে হিন্দি গান বাজিয়ে পাড়া মাত করে সন্ধ্যার মুখে ফটিক মেকআপ্‌ নিয়ে বসেছে পূজোয়। থলিতে প্রণামী পড়ছে। হোঁৎকা ভলেনটিয়ারী শুরু করে, পটলা লাল চেলির কাপড় পরে পূজোয় বসেছে—ফটিক তন্ত্রধার। আমরা সব দিক সামলাচ্ছি।

রাত্রি হয়ে আসতে পূজোর পর প্রসাদ বিতরণও হয়ে গেছে। হিসাব করে দেখা গেল, এক সন্ধ্যায় খরচখরচা বাদ দিয়ে নগদ লাভ বাহান্ন টাকা।

হোঁৎকা তখনও শশা খেঁজুর পানিফল চিবুচ্ছে। আর সন্দেশ যা পড়েছিল তাও কম নয়। হোঁৎকা বলে—এবার যমরাজের পূজাই এস্‌টাব্লিশ কইরা ফেলি।

অবাক্ হই—যমরাজের পূজা।

হোঁৎকা বলে—যমরাজমে ডরায় না কে—ক'দিন? বুঝলি নতুন কিছু করার লাগবো!

যমরাজের পুজোও হয়ে গেল। তাছাড়া ফটিক এখন শনিবারের পুজো সাব-কমিটির সেক্রেটারি। সপ্তাহে ক্লাবের কিছু আমদানিও হয়। আরও আশ্চর্যের কথা, জায়গার মালিক সেদিন এসে অবাক হয়ে যায়। তখন সমারোহ করে শনিপূজা হচ্ছে।

হোঁৎকা এবার গলায় জোর এনে বলে—জায়গার দখল নিতি চান—ভাঙ্গেন শনি মহারাজকে! যান—চুরমার কইরা ছ্যান ওরে।

ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন—ওগো! কি করছো?

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে একটু তর্জন-গর্জন করেছিলেন। হোঁৎকার ওই এক কথা! সকলেই ঘাবড়ে গেছি। আবার হোগলার চালা মাথায় করে সরে যেতে হবে। কষ্টও হয় ভাবতে।

হোঁৎকা বলে—ভাঙ্গেন! আমাগোর দ্বারা হইব না। আপনি দেবতারে ভাইঙ্গা জলে ফ্যালাইয়া এ জাগার দখল নেন!

ভদ্রলোক বেশ অবস্থাপন্নই। মেজাজীও। তিনি বলেন—লোকজন এনে তাই করবো! মানি না দেবতা-ফেবতা।

ভদ্রলোকের স্ত্রী ধমকে ওঠেন—কি বলছো তুমি? এত জায়গা তোমার—একটু নিয়ে ছেলেরা মন্দির করেছে, জায়গা পবিত্র হয়ে উঠেছে। ওটা থাক।

হোঁৎকা আবেগ ভরে বলে ওঠে—তাই কন্ মাসীমা। দেবস্থান করছি—শিশুগোর জন্য খেলার মাঠ করছি, নিতে চান—ন্যান্!

মাসীমা বলেন—না। এ জায়গাটুকু বাদ রেখে বাড়ির প্ল্যান করাবো।

নিজেই পাঁচ টাকা প্রণামীও দেন!

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব এখন রম্‌রম্ করে চলেছে। নিজস্ব জায়গা-ঘর, আর রেগুলার ইন্‌কামের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে আমাদের। আর পটলাও ইদানীং তার বাবার বাতিল অযান্ত্রিক একটা অস্টীন নিয়ে মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়।

বলে সে—ড্রাইভিং শি—শিখছি! একদিন পিকনিক করতে যাবো আমাদের বাগানে!

পিকনিক্-এর নাম শুনে সকলেই খুশি। তাছাড়া গাড়ি যখন হাতেই আছে, যাতায়াতের খরচাও নাই, পটলাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর আমাদের ইতি-উতির সব ঘটা, মায় আলুকাব্‌লি, মালাই ঝালমুড়ির খরচা তারই।

ফটিক বলে—শনিপূজা কমিটি থেকে শতখানেক টাকা দেব।

হোঁৎকা খুশিতে ফেটে পড়ে—ব্যস! তর শনি ঠাকুর বাঁইচা থাক্ ফটিক। তয় মেনুখান্ কইরা নিই?



হোঁৎকা কাগজ কলম নিয়ে বসবার আগেই ফরমাইশ করে—চা আর খান দুই টোস্ লই আয়। বুদ্ধিটা ওর কিছু না খেলে খোলে না।

ফটিক বলে—ম্যালা ঝামেলা করে কাজ নাই। ধর ভাত আর মুরগীর মাংস, শেষ পাতে দই মিষ্টি।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—মাছ হইব না? ওই মুরগী তো হইবই, মাছও চাই।

পটলা আশ্বাস দেয়—বাগানের পুকুরে মাছ আছে, জালও পাবি। মাছ হয়ে যাবে।

হোঁৎকা তখন রিভাইজ মেনু করতে বসে—মাছের মাথা দিই মুড়োঘণ্ট, বাঁধাকপি মাছ দিয়া, মাছের কালিয়া, সাথে টু পীস্ কইরা মুরগীর কারি, চাটনি, দই আর বারাসতে শুনছি কাঁচাগোল্লা বানায় ভালো, তাই থাকবো।

ফটিক বলে—এ যে বিয়ের ভোজ হয়ে গেল রে?

—সাট্ আপ্! হোঁৎকা গর্জে ওঠে। বলে সে—শুভকাজে ও সব কইবি না। খামু তো একদিন। পটলা এত কইরা কইছে না, খালি দুঃখ পাবে ব্যাচারি!

পটলা অবশ্য তখন বিপদেই পড়েছে। খাবার যা ফর্দ ধরেছে, তাতে ওদের একশো টাকার অনুদান সমুদ্রে ধুলো মুঠোর মত মিলিয়ে যাবে, বাকি টাকার যোগাড় তাকেই করতে হবে। নাহলে হোঁৎকার দল মাছের মাথার বদলে তার মাথাটাই চিবিয়ে খাবে।

এখন ঠাকুমার কাছেই কিছু বের করতে হবে, পটলা চুপসে গেছে সাত-পাঁচ ভেবে।

হোঁৎকা আমি ফটিক গদাই সকালেই তৈরী হয়ে ক্লাবে এসে গেছি। আজ সেই পিকনিকের দিন। কাঁধে সাইড-ব্যাগ, পটলা আবার মাথায় একটা টুপি পরেছে সুটিং পার্টির মত, এর মধ্যে বনমালীর দোকান থেকে পটলার একাউন্টে বার দুয়েক চা-পকৌড়া সেবা

হয়ে গেছে। বেলাও বাড়ছে। শীতের দিন, তায় ছাব্বিশে ডিসেম্বর। ভোর থেকেই দেখছি রাস্তা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে ট্রাকে-টেম্পোতে করে এন্তার পিকনিক করতে চলেছে।

তীব্র সিটির শব্দ, দুমদুম্ বাজনা বাজছে—আর উদ্দাম নাচের ছন্দ তুলে চলেছে একটা ট্রাকের উপর কিছু ছেলের দল। কেউ সজোরে শিঙে ফুঁকছে।

ফটিক বলে—বেলা হয়ে গেল। এখনও পটলার ছাখা নেই। হোঁৎকা বলে—কখন গিয়া মাছ ধরুম, রান্নাই করুম! পটলা এক্যাখান ক্যাডাভারাস্!

আমি বলি—একবার খবর নোব বাড়িতে?

হোঁৎকাও ভাবছে, হঠাৎ আটাকলের মোটর চালু হবার মত বিকট শব্দটা কানে আসে। রাস্তায় ধুলো উড়ছে—দুটো থিয়েভাজা কুকুর চিৎকার করে রাস্তায় উঠে প্রাণ বাঁচালো। সশব্দে পটলা গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—এ্যাতো দেরী হইল ক্যান্? টাইম জ্ঞান নাই—এর লগ্যে বাঙালী জাতটা রসাতলে যাইব!

পটলা বলে—ম-ম্যানেজ করে বের হতে হবে তো? বাবা কারখানায় যেতে তবে পিছন দিয়া গাড়িখানা নিয়ে বের হয়েছি। পথে আবার ইঞ্জিন ট্রাবল।

হোঁৎকা বলে—এদিকে প্যাটের ট্রাবল শুরু হইয়া গেছে গিয়া!

পটলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে সে—ব-বলিস কি? এ্যাঁ—তাহলে পিকনিকে যাবি না? ওদিকে সব আয়োজন র-রেডি! তবে প-পেট খারাপ হলে কি আর করবি?

আমরাও অবাক হই। বিনা পয়সায় এমন ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া—এসব হবে না, তবে সাত-সকালে সেজেগুজে বের হয়েছি কেন? শুধোই—কি রে হোঁৎকা, যাবি না?

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—কে কইল যামু না?

পটলা শোনায়—তোর প-পেট খারাপ—পেট বেদনা—



হোঁৎকা বলে—ক্ষুধায় প্যাট ব্যথা করতিছে। সমী—কয়ে দে বনমালী রে মামলেট-টোস-চা দিতি। খালি প্যাটে থাকলি প্যাটে ব্যথা করে আমার! জলদি দিতি ক! যাইতে লাগবো!

পটলা চুপসে যায় হোঁৎকা গোগ্রাসে রুটি ডবল মামলেট গিলছে। আমরা টোস্ট-চা নিয়েই পটলাকে কিছুটা অব্যাহতি দিলাম! হোঁৎকা গিলে-কুটে লম্বা একটা ঢেঁকুর তুলে বলে—চল গিয়া। দেরী হইয়া গেল।

পটলার কেরামতি কিছু কিছু এর আগেও দেখেছি, এখন দেখছি অন্য ধরনের কসরত। পটলা গাড়ি নিয়ে চলেছে হাইওয়ে ধরে, সাঁ-সাঁ করে ট্রাক-বাস-প্রাইভেট গাড়িগুলো বের হচ্ছে, পটলার পৈত্রিক সেই অস্টিন চলেছে রাস্তার একপাশ দিয়ে গুড় গুড় করে।

ফটিক বলে—একটু জোরে চালা।

হোঁৎকা শোনায়—হঃ! পটলা—ই কি গাড়ি রে—বাঘের বাচ্চা! হতভাগায় হক্কলেরে তাড়াই লইয়া যায়।

পটলা এবার ফাঁকা পেয়ে গাড়িতে স্পীড তোলবা মাত্র মনে হয় গাড়িখানা টুকরো হয়ে ছিটকে পড়বে। আর গাড়ি যেন ঝটকা মেরে লম্ফ দিয়ে চলেছে।

হোঁৎকা বলে—চেল্লাস ক্যান্! পক্ষীরাজ-এর বাচ্চা! লম্ফ দিয়া কদম চালে চলতিছে। সাবাস পটলা—

পটলা তখন দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে সামলাবার চেষ্টা করছে, যেন রাস্তা থেকে ছিটকে না পড়ে। সারা গাড়ি তখন নাচছে আর ভিতরে নাচছি আমরা।

—পটলা, থামা গাড়িখান্।

পটলা যেন কানে তুলো গুঁজে আছে। প্রাণপণে স্টিয়ারিং-এর উপর পড়ে তখন রাস্তার দিকে চেয়ে বলে—চ-চুপ করে থাক।

হঠাৎ একটা গাড্ডায় পড়েছে, সারা গাড়িটা শূন্যে উঠে সশব্দে

আছড়ে পড়ে আবার ছুটতে থাকে, আর ভিতরে ফটিকের মাথাটা হুড়ের শিকে লেগেছে, আর্তনাদ করে ওঠে সে—অয় বাপ্ !

পটলা বলে—চুপ করে থাক। আর এসে গেছি।

গাড়িটা এবার বড় রাস্তা ছেড়ে সরু রাস্তায় গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে। মাঝে মাঝে পুকুর-বাগান—ধানক্ষেত-নারকেল বাগান দেখা যায়। শান্ত পরিবেশ।

হোঁৎকা চিৎকার করে—বারাসত হইয়া যামু, কাঁচাগোল্লা দই কিনতে লাগ্‌বো।

পটলা শোনায়—এ গা-গাড়ি বারাসতের পথ চিনবে না, শুধু বাড়ি আর বাগানের পথ চে-চেনে।

অবাক হয়ে বলে—গাড়ি আবার পথ চিনবে কি রে ? তুই তো পথ চিনিস। চালিয়ে নিয়ে যাবি !

পটলা হাঁপাচ্ছে। বলে সে—দেখলি না, স্টিয়ারিং সিধা রেখে-ছিলাম, এখানে এসে গাড়িটা আপনমনেই এই প-পথেই ঢুকে গেল !

হোঁৎকা আপশোস করে—তয় দই সন্দেশ হইব না ? দু'খানা আইটেম—

পটলা আশ্বাস দেয়—বাগানের ওদিকেও বড় গ্রাম আছে, দই সন্দেশ ওখানেই মি-মিলবে। একদম পি-পিওর !

হোঁৎকা চাইল। বেলা তখন অনেক হয়ে গেছে। রুটি মামলেট সব ওই গাড়ির কুলোয় আছড়ানো অবস্থায় হজম হয়ে গেছে। কখন যে খাওয়া জুটবে কে জানে ?

কোন বাগানে মাইকে গান বাজছে, কিছু ছেলেমেয়ের দল পিকনিক করছে। ওদিকে উনুনে কড়াই চেপেছে। খেলাধুলো করছে তারা বোধ হয় সকালের জলযোগ সেরে। মাংস রান্নার খোসবু ওঠে। কড়াই-এ গরম বেগুনি ভাজা হচ্ছে !

হোঁৎকা জিব দিয়ে জল টেনে বলে—চল্ জলদি। ছাখা যাক্—কি জোটে !



ফটিকের এতক্ষণে খেয়াল হয়। তার পকেটে শনি ঠাকুরের তহবিল থেকে ফিস্টের অনুদান বাবদ একশো টাকা নিয়ে এসেছে, তার থেকেই দই সন্দেশ হতো।

ফটিক বলে—শনি মহারাজের ফাণ্ড ভেঙ্গে দই সন্দেশ খাস্ নি আর হোঁৎকা ?

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—সাট্ আপ ! শনি মহারাজ কত লোককে রাজা বানায়, তারা হালায় নিত্যি রাজভোগ সাটতিছে, আমাদের একদিন খালি যতো দোষ ? থো ফ্যালাই তর শনি ঠাকুর ! চল পটলা—

এবার পটলার গাড়ি ওই খোয়া ঢাকা রাস্তায় হঠাৎ বিকট গর্জনে ঝম্প্ দিয়ে চলেছে, যেন যুদ্ধের ঘোড়া ছুটছে। আর হঠাৎ বিকট শব্দে একটা আওয়াজও বের হয়, তবু দমে নি গাড়ি।

স্তব্ধ গ্রামের সবুজে রাইফেলের গুলির মত আওয়াজ উঠতে সেই পিকনিক পার্টির সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে, গাড়িখানা একরাশ ধুলো উড়িয়ে আর একটা লম্ফ দিতেই বিকট শব্দে নীচেকার জীর্ণ একজস্ট পাইপটা খসে পড়ল। গাড়ি থামার নাম নেই। পাইপ খসে পড়তে এবার কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মত—আর উড়ছে ধুলো—ছুটছে গাড়ি তীরবেগে।

আদ্যিকালের যন্ত্র-দেবতা এবার ধোঁয়ার পুঞ্জ ছেড়ে রকেটের মত চলেছে, যে কোন মুহূর্তে যেন মাটি ছেড়ে শূন্যপথেই উঠে যাত্রা করবে মহাকাশের দিকে।

কয়েকটা মুরগী চরছিল পথে—সেগুলো গাড়ির আগে আগে দৌড়চ্ছে প্রাণভয়ে। হোঁৎকার জিভে জল আসে নধর চিত্র-বিচিত্র মুরগী দেখে। বলে সে—ধর ! চাপা দে ওরে পটলা !

তার আগেই মুরগীগুলো শূন্যে উঠেছে, আর হোঁৎকাও বাইরে হাত বাড়িয়ে একটা বড় মোরগকে খপ্ করে ধরেছে। ঝটপট করছে সেটা !

হোঁৎকা মাল ক্যাচ্ করে বলে—পটলা, ফুল ইস্‌পিডে গাড়ি চালাবি।

মুরগীটা ভিতরে ঝটপট করছে, আর বাইরে তখন কলরব ওঠে। কারা চিৎকার করছে—মুরগীটা লইয়া ভাগছে! ধর—ধর—

ধোঁয়া-ধুলোয় দৃষ্টি আড়াল করে পক্ষীরাজ ছুটে চলেছে বিকট শব্দে, রাস্তার এদিক-ওদিক জুড়ে। পিছনে কলরব-চিৎকার ওঠে। কয়েকটা কুকুর তেড়ে তেড়ে আসছে।

আমি বলি—ছেড়ে দে হোঁৎকা!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—সাট আপ!

কিন্তু এই মৌকায় মুরগীটাও ছাড়া পেয়ে জানলা গলিয়ে ফর্‌ফর্ করে উড়ে বের হয়ে যেতে হোঁৎকা হাঁক পাড়ে—দিলি তো ওটা রে ছাড়ায়ে?

মুক্ত মুরগী তখন ফিরে গেছে, আমাদের তবু ফেরার অবস্থা নেই, গাড়ি তখন ঝম্পক রথে পরিণত হয়েছে, হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে পটলা—

—স্—স্—সামাল!

ওর জিভটা যথারীতি আলটাকরায় লেগেছে আর গাড়িও এবার সিধে রাস্তা ছেড়ে ঢালু বেয়ে গড়িয়ে নামছে ঝন্‌ঝন্-দুড়দাড় শব্দে।

চিৎকার করে উঠি—পটলা।

পটলা ঘামছে, কি বলার চেষ্টা করে, কিন্তু গাড়ি চলেছে নিজের মেজাজে, সামনে একটা নোনা আতার গাছ, ওটাতে ধাক্কা মারতে বোধহয় পছন্দ হল না—এড়িয়ে গিয়ে সবুজ সিম মাচার মধ্যেই সেঁধিয়েছে। মাচার বাঁশ কঞ্চি, ডালপালা ভাঙ্গছে মড়মড় করে, ওদিক থেকে এক বুড়ি বের হয়েছে ঝাঁটা হাতে, চিৎকার করে—কোন্ মুখপোড়া ড্যাকরা সব্বনেশে! ও মা, আমার সিমমাচা নে গেল!

গাড়ি কিন্তু থামে নি। বনেদী ইংরেজ কোম্পানীর গাড়ি, বুড়ো



হলেও তেজ যায় নি, মাচা ফুঁড়ে এদিক থেকে ওদিকে বের হয়েছে, আর বনেট—গাড়ির ছাদ—গা সব ঢেকে জম্পেস হয়ে জড়িয়েছে বুড়ির ফলন্ত সিমমাচা।

একটা সবুজ সিমমাচা ফুল-ফল সমেত এবার ছুটে চলেছে। পটলা চিৎকার করে, তার জিভটাও সেঁটে গেছে আলটাকরায়, মনে হয় তোতলা লোকদের যেন পুলিস ড্রাইভারির লাইসেন্স না দেয়। লোককে বিপদের সময় হুঁশিয়ার করতেও পারবে না। পটলারও ঠ্যাং ফেল করেছে—তার গাড়িরও ব্রেক ফেল করেছে। গাড়ি চলেছে নিজের মেজাজে। আর এভাবে ঘিরে ধরেছে সিমের লতার বেষ্টনী যে বেরুবার উপায় নেই। বুড়ি পিছনে দৌড়চ্ছে ঝাঁটা হাতে। দল বেঁধে দৌড়চ্ছে ছেলের দলও।

আর দুটো গরুও পাশাপাশি দৌড়চ্ছে—তাদের নজর ছিল বুড়ির সবুজ সিম মাচার দিকে, এতদিন বাগে পায় নি। আজ চলন্ত সবুজের পিণ্ড থেকে গরু দুটো খাবলে খাবলে খাচ্ছে লতাপাতা আর দৌড়চ্ছে ধাবমান গাড়ির সঙ্গে সমান তালে।

পটলা চিৎকার করে—ব—ব—বাগান প—পার হয়ে গেল। ধ—র, বাগানকে কি কি ভাবে ধরা যায় জানি না, গাড়ি তখন একদিকে কাত মেরে চলেছে, আমরা কুপোকাত হয়ে আছি, হোঁৎকার ঠ্যাং দুটো বের হয়ে গেছে জানলা দিয়ে, সে পড়েছে পিপের মত।

পটলাদের বাগানও হড়কে গেল, গাড়ি থামে নি। গাড়ি নেচে নেচে কাত হয়ে দৌড়চ্ছে। হঠাৎ বাঁশগাছের ধাক্কায় বনেটটা উড়ে গেছে, আর বিকট শব্দে তখন মেশিনগান ফায়ারিং করে চলেছে ইঞ্জিনটা।

চিৎকার কলরব ওঠে পিছনে। গ্রামসুদ্ধ লোক চিৎকার করছে—ডাকাত! ডাকাত!

গাড়ি তবু থামে নি, পটলাও স্টিয়ারিং ধরে যুদ্ধ করে গাড়িকে

রাস্তায় তোলার চেষ্টা করে চলেছে। গাড়িও এবার পথে উঠে বিকট শব্দে মেশিনগান ফায়ার করে দিগন্ত সচকিত করে চলেছে।

হঠাৎ পেছনে সাইরেনের শব্দ।

হোঁৎকা বলে—পুলিসের গাড়ি বোধ হয়। সারছে—থামা! পটলা! তরে খুন করুম!

ইংরেজ কোম্পানীর গাড়ি এবার তাক্ বুঝে রাস্তা দিয়ে হড়হড়িয়ে নেমে ছুটে চলেছে মজা ডোবার দিকে, বোধহয় এতখানি পথ দৌড়ে তারও জলতেষ্টা পেয়েছে। সর্বাঙ্গে সিমের লতা, একটা বাঁশ সিধে খাড়া হয়ে উঠেছে জয়ধ্বজের মত। বিচিত্র রথ এবার সিধে জলের টানে চলেছে, ডোবাতেই ফেলবে। নামবার পথ নাই! গাড়িতে নৃত্যবেগে দরজার লকটা জম্পেস হয়ে জমে গেছে। চিৎকার করছি। গাড়িখানা সিধে বাংলাদেশের সরস কাদার মধ্যে পড়েছে। এতক্ষণে ইংরেজের দফারফা শেষ। গাড়িখানা গর্জন করতে করতে কাদায় জলে এসে থামল। সামনে রেডিয়াটের দিয়ে তখন রেল ইঞ্জিনের মত স্টিম বের হচ্ছে। পেছনে এসে থেমেছে পুলিসের গাড়ি—আর তার পেছনে শ' চারেক মেয়ে-ছেলে লোকজনের জনতা।

টেনেটুনে বের করেছে আমাদের। কপাল ফুলে আমড়ার আঁটি কারো চোখ ঢেকে গেছে, মাথায় আব—জামা ছেঁড়া। আবৃত রক্তাক্ত পঞ্চপাণ্ডবকে বের করেছেন দারোগাবাবু! পটলা বলে ওঠে—পি—পি—পি—

দারোগাবাবু ধমকে ওঠেন—চোপ্!

হোঁৎকা বলে—সত্যি স্যার, পিকনিক কইরতা আসছিলাম—

দারোগাবাবু গর্জে ওঠে—পিকনিক না আর কিছু! কার গাড়ি?

পটলা বলে ওঠে এবার—বাবার!

লাইসেন্স আছে?

পটলার ওসব বালাই নাই। দারোগাবাবু গর্জন করেন—টেনে নিয়ে চল থানায়। তারপর দেখছি।



থানা থেকে পটলার কাকা গিয়ে ছাড়িয়ে আনলেন, তখনও রাত্রি প্রায় ন'টা। তারপর আর পিকনিক করা যায় নি।

পটলাকে তিন চার দিন দেখা যায় নি। ফটিক বলে—দেখলি তো, বললাম শনি ঠাকুরের পয়সা ভেঙ্গে পিকনিক করবি না—

হোঁৎকা বলে—ঠিক আছে! এই শনিবারই ঠাকুরের ভোগ দিই নরনারণ সেবা কইরা ফ্যাল! উঃ—কি পিকনিক করতেই না গেছলাম। তর শনি মহারাজ সত্যিই জাগ্রত—খুবই জাগ্রত!

———

www.arisumu.com

www.arisumu.com

# হোঁৎকার ভ্রমণ কাহিনী

ভ্রমণকাহিনী

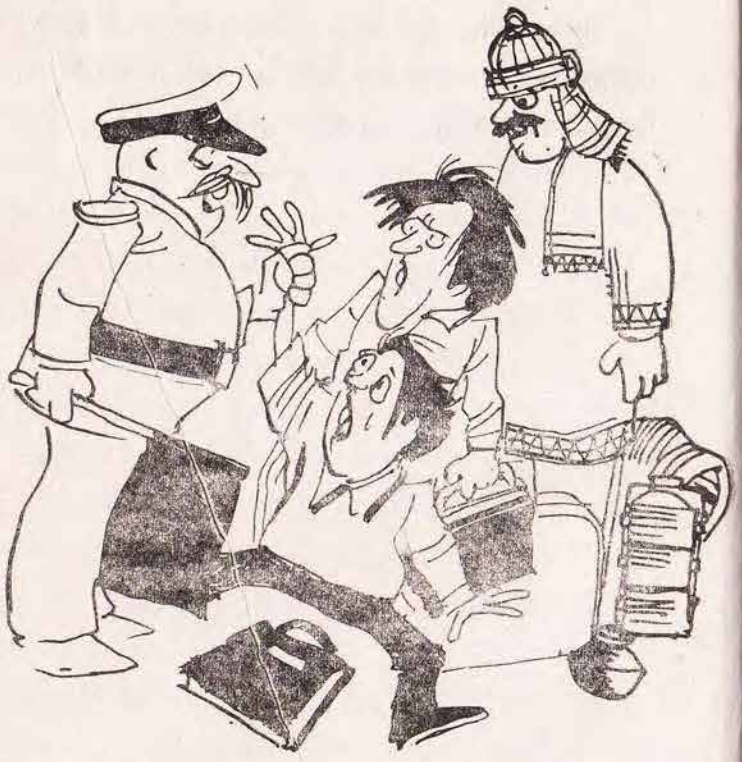

রাতভোর ট্রেন যাত্রার শেষে যখন জামশেদপুরে নামলাম তখনও টিপটিপ বৃষ্টি সমানে চলেছে। অবশ্য বৃষ্টিটা পিছনে লেগেছিল খড়গপুর থেকেই।

পটলার নতুন জামাইবাবু থাকেন বাদাম পাহাড়ে। এর আগেও পটলার ছোটদি ও জামাইবাবু বারবার করে বলেছিল আমাদের বাদাম পাহাড় বেড়িয়ে আসতে।



খুব নাকি সুন্দর জায়গা! আর ওখানের স্টেশন মাস্টার হয়েই গেছেন তিনি। পাহাড়ের কোলে নির্জন স্টেশন-এর লাগোয়া ছোট্ট সুন্দর কোয়ার্টার।

চারদিকে সবুজ বনঢাকা পাহাড়। ওদিকে শাকসব্জি, টম্যাটো খুবই মেলে। দুধ তো জলের দরই, আর মেলে মুরগী। তাজা নধর মুরগীর দামও ওখানে খুব কম, রোজই মুরগী সেবা হতে বাধা নেই।

হোঁৎকা সব শুনে-টুনে বলে—তয় মনে লয়—জাগাটা মন্দ নয়, চলেই যাই।

ফটিক আবার প্রকৃতিপ্রেমিক। সে বলে, ন্যাচারাল বিউটি খুব ভালো রে ওদিকে, পটলা, তোর দু-চারটা কবিতাও এসে যাবে।

ওসব তো বুঝলাম, কিন্তু ফাণ্ড খুবই শর্ট। ফুটবল ফাইন্যাল খেলতে গিয়ে বেশ কিছু টাকা চলে গেছে, অন্য পথেও পয়সাকড়ি কিছুর আমদানি নেই।

হোঁৎকা আবার ধরছে ব্রিজ কমপিটিশন লাগাতে হবে, গোবরাও তাতে সায় দিয়ে রীতিমত পাবলিসিটিও করেছে। ইদানিং হোঁৎকা গোবরাকে দেখি পাড়ার সরসীবাবু, নতুনদাদের সঙ্গে বসে কি সব তাসটাস খেলছে।

তাস-ফাস আমাদের মাথায় আসে না।

সাহেব, বিবি, গোলাম নামের সঙ্গে পরিচয়ও তেমন নেই। একজন সাহিত্যিক ওই নামে একটা বিখ্যাত বইও লিখেছেন। বাড়িতে বাবা-কাকা-কাকীমার হাতে হাতে ওই বইটাকে ঘুরতে দেখেছি, কিন্তু পড়ার সুযোগও পাইনি।

তাস-টাস নিয়ে তাই মাথা ঘামইনি, ইস্কাপন-হরতন-রুইতনও ঠিক চিনি না।

পটলাও ওসবে নেই।

ইদানিং সে ভ্রমণ কাহিনী লিখছে কবিতা লেখা ছেড়ে। পাঁচ-খানা ভ্রমণ কাহিনী অলরেডি লেখা হয়ে গেছে। তার মধ্যে ঐতি-হাসিক গড়ভবানীপুর ভ্রমণ তো রীতিমত লোমহর্ষকই হয়েছে।

পটলা বলে—ক্লাবে তাস-টাস চলবে না। নেভার! সুতরাং ওর ভেটো প্রয়োগে হোঁৎকার তাসের প্রাসাদ চুরমার হয়ে গেছে। তাই ওই ভ্রমণের কথাই ভাবছি।

কিন্তু ক্লাব ফাণ্ডের ভাঁড়ে মা ভবানি। এদিকে বাদাম পাহাড় গেলে খরচা কিছু আছে। ওখানে থাকা খাওয়া তো না হয় পটলার জামাইবাবুর ঘাড়েই হবে। কিন্তু যাতায়াত গাড়িভাড়াটা তো ওই জামাইবাবুর কাছে চাওয়া যায় না!

হোঁৎকা বলে—ট্রেন কোম্পানী যা ভাড়া বাড়াইতেছে তাতে আর যাওয়া যাইব না। তয় এক পথ আছে গিয়া—

ওর দিকে আশাভরে চাইলাম, হোঁৎকা বিজ্ঞের মত বলে—ডবলু-টি, উইথআউট টিকিট।

ধমকে ওঠে পটলা—থাম তো! লজ্জা করে না! ধ-ধরা পড়লে জে-জেল হয়ে যাবে।

গোবরার আবার জেল পুলিসের নামে এ্যালার্জি হয়ে যায়। সে বলে—তাহলে যাবেই না।

শেষ অবধি খানিকটা আশার আলো দেখায় অনিল কেবিনের মালিক অনিল সাঁপুই। ও ইদানিং আচারের ব্যবসা শুরু করেছে আর রমরম চলছে।

ঈষৎ নুন ঝাল আর তেলের সঙ্গে মবিল দিয়ে কিছু আম-আমড়া-পাতিলেবুর সঙ্গে মিশিয়ে ঝাড়চ্ছে। ভাল আমদানিই হয়। বলে সে —বাদাম পাহাড়ে এ সময় খুব আমড়া হয়, এখানের যা চালানি আমড়া ত্যাখো, সব ওখান থেকেই আসে। পাঁচজন নিদেন পাঁচ বস্তা আমড়া যদি আনতে পার, পঞ্চাশ টাকা দেব।

শেষ অবধি গোবরা দরদাম করে আশি টাকা রফা করে। শুনেছি ওখানে নাকি পাঁচ টাকা বস্তা।

হোঁৎকা বলে—বাকিটা ম্যানেজ কর পটলা। ঠাক্‌মারেই ক' গিয়া। হাফ ম্যানেজ হইছে—বাকিটাও হইবো।



কিন্তু ঠাক্‌মা কঠিন পাত্র। শেষ অবধি ছোটদিকে দেখার জন্য খুব মন খারাপ করছে, ইত্যাদি বলে-টলে কোনমতে শতখানেক টাকা ম্যানেজ হয়েছে।

হোঁৎকা বলে—টাইট বাজেট। পথে বেশি খাই খাই করবি না।

গোবরা বলে—তবে কি স্রেফ হাওয়া খেয়ে যেতে হবে?

হোঁৎকা শোনায়—এ্যাডভেঞ্চার করতি গেলে হকল দুঃখ কষ্টই সইবার লাগবো। পড়সনি কলম্বাসের অভিযান-এর কথা, দুর্গম মরুকান্তারে ভ্রমণ?

গোবরা ওই ব্যাপারে একটু কমা। তাই চুপ করে থাকে।

হোঁৎকা গম্ভীর ভাবে বলে—বিদ্যাভাস করতি লাগবো, বুঝলি? যা কইলাম তাই করতি হবে।

ফলে এবারের যাত্রাটা কষ্টকরই হয়ে উঠেছে।

বাড়ি থেকে পটলা একরাশ লুচি, আলুর দম, ডিমসেদ্ধ নিয়ে উঠেছে। কিছু সন্দেশ আছে।

ওই পুঁটুলিটা আমার জিম্মায়। রাতের ট্রেন। সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে খেয়ে ট্রেনে উঠেছি। ফের খাওয়া হবে কাল সকালে।

কিন্তু ট্রেনে উঠলে খিদেটা বেড়ে যায়।

আর তামাম হকারের দলও যেন ট্রেনেই উঠেছে। ঝালমুড়ি-বাদাম-ঘুঘনি-কফি, কোল্ড ড্রিঙ্ক, চা, মায় উলুবেড়িয়ার ডাবের কাঁদি অবধি ওঠে।

হোঁৎকা বলে—বাদাম কিছু নিই, কি বল?

আমি জানাই—টাইট বাজেট রে। ওই বাদাম ছাড়া আর কিছুই হবে না।

গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে।

বাদাম তার আগেই শেষ। পেটের ভাত কখন হজম হয়ে গেছে।

গোবরার নজর এখন লুচির পুঁটলির দিকে। হোঁৎকাও শেষ বাদামের কণাটা চিবিয়ে বলে,

—লুচি খান চারেক করে ম্যানেজ কর সমী। ক্ষুধা লাগছে। রাতভোর জার্নি করতি হইবো।

গোবরাও সায় দেয়—ঠিক কইছিস, দে—

বলি—শুধু মাত্র চারখানা করে নিবি; কাল সকালে না হলে উপোস দিতে হবে। বাদাম পাহাড় পৌঁছবি বেলায়।

—পরের কথা পরে ভাবা যাবে। গোবরা লুচির মোড়ক খুলে মন্তব্য করে।

গাড়ি ছেড়েছে।

রাতের অন্ধকারে গাড়ি চলেছে। কোলাঘাট ব্রিজ পার হবার সময় দেখা যায় লুচির পুঁটলি শেষ আলুর দমের কাই কিছু লেগে আছে শালপাতায়।

নদীর জলে কলাপাতা শালপাতা বিসর্জন দিয়ে এবার নিঃস্ব হয়েই চলেছি আমরা। আর শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

বৃষ্টি শুরু হলেই আমার মনমেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হোঁৎকা বলে—বর্ষাকালে বৃষ্টি তো হইবো। নয় এগ্রিকালচার হইবো ক্যামনে?

বৃষ্টির জন্যই বোধহয় রাত গভীর হওয়ার ফলে হকার বাহিনী রণে ক্ষান্ত দিয়েছে। আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙলো পটলার ডাকে। তখন ট্রেন জামশেদপুরে ঢুকছে।

বেশ বড় স্টেশনই।

তখন ভোর হয় হয়। কিন্তু মেঘে ঢাকা থাকার ফলে আকাশ পরিষ্কার হয়নি।

এখানেই ট্রেন বদলাতে হবে। ওদিকে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। এই ট্রেনের যাত্রী নিয়ে ছাড়বে। ওই বৃষ্টির মধ্যে কোন রকমে আধভেজা অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠেছি।

এ ট্রেন যাবে ব্রাঞ্চ লাইনে, তাই একরকম ফাঁকাই। এদিক-ওদিকে দু-চার জন যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। আমাদের পিছু পিছু একটি তরুণও উঠলো। কুলির মাথায় সুটকেস, হোল্ডঅল,



বিরাট একটা টিফিন কেরিয়ারও রয়েছে। বেশ আয়েস করে হোল্ডঅল খুলে শুয়ে পড়লে সেও।

ট্রেন চলতে শুরু করে।

তখনও আবছা অন্ধকার রয়েছে। ফাঁকা ট্রেনে টানটান হয়ে শুয়ে তখনও বাকি ঘুমের জের টানার চেষ্টা করছি। আর নামা-ওঠার ব্যাপার নেই। এ ট্রেন গিয়ে থামবে বাদাম পাহাড়ে।

ঝিমিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে ট্রেনখানা।

হঠাৎ একটা স্টেশনে দাঁড়াতে চাইলাম, পটলা এর আগে একবার এসেছিল ওর জামাইবাবুর ওখানে, তাই পথ কিছুটা চেনে। কিন্তু বাইরে স্টেশনের নাম পড়ে চমকে ওঠে সে।

ওর ডাকাডাকিতে উঠলাম আমরা।

পটলা বলে—অন্য ট্রেনে উঠে পড়েছি রে। এ তো চাণ্ডিল!

চমকে উঠি—বাদাম পাহাড় যাবে না এ ট্রেন?

একজন যাত্রী বলে—জামশেদপুরে একই প্ল্যাটফর্মে এক নম্বর দু নম্বর ছুঁয়ে দু জায়গায় দুটো ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই এমন ভুল অনেকেই করে। এখানেই নেমে যাও তোমরা। চাণ্ডিল জংশন থেকেও বাদাম পাহাড় যাবার গাড়ি মিলবে।

পাশের সেই তরুণটিও বলে—তাই নাকি আপনাদের দেখে আমি ভি উঠলাম এ ট্রেনে। আমি ভি বাদাম পাহাড় যাবে।

পটলা বলে—তাহলে নেমে পড়ুন। দেখা যাক, এখান থেকে কখন ট্রেন মেলে? উঃ—কেবল মিসটেকই হচ্ছে!

হোঁৎকা এর মধ্যে টানাটানি করে মালপত্র নামালো। কুলির বালাই নেই। সেই তরুণটির ইয়া সুটকেস-হোল্ডঅল, মায় টিফিন কেরিয়ারও নামানো হলো।

আর সেই বিশ্বাসঘাতক ট্রেন অচেনা ছোট্ট এই স্টেশনে আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল।

নামেই জংশন। লোকজন বিশেষ নেই। চারদিকেই পাহাড়।

উপত্যকার এই স্টেশন, আর মালগাড়ির ভিড়ই বেশি। এখানের স্টেশন-গুলো দিয়ে-লোহা পাথর-কাঠ-কাঠের গুঁড়ি—নানা জিনিস যাতায়াত করে। তাই যাত্রীবাহী ট্রেনের থেকে মালগাড়ির যাতায়াতই বেশি। সারবন্দী ওয়াগন টেনে দীর্ঘ মালগাড়িগুলো চলেছে।

বেলা হয়ে আসছে।

স্টেশনে চা আর শুকনো বিস্কুট ছাড়া কিছুই মেলে না। খিদেও লেগেছে। আর বাদাম পাহাড় এখান থেকে দূরেই। যাত্রীবাহী ট্রেন আগেই চলে গেছে। এখন মালগাড়ি একটা মিলতে পারে, যদি তার গার্ড সাহেবকে রাজী করাতে পারি তাহলে তাতে উঠে বৈকাল নাগাদ পৌঁছবো।

—না হলে?

আমার কথায় কুলিটা বলে—বাদাম পাহাড় যাবার লাস্ট টেরেন মিলবো করিব্ রাত সাত বাজে, উধার সাড়ে ন'বাজে পৌঁছবে, লেকিন কব্ যায়েগা ঠিক নেহি।

অর্থাৎ সারাদিন মাঝরাত অবধি পড়ে থাকতে হবে—যদি এই মালগাড়ির গার্ড সাহেব আমাদের না উঠতে দেন।

সঙ্গী তরুণটি নিজের নাম বলে—প্রেমবল্লভ আগরওয়াল হামার নাম, বাদাম পাহাড়ে হামার শ্বশুরাল আছে। লগ্-কনট্রাক্টারি বিজনেশ আছে আমার শ্বশুরের। রহিস্ আদমি—

হোঁৎকা বলে—এ বনবাদাড়ে শ্বশুরবাড়ি কইরা এহন বোঝ ঠ্যালাখান!

প্রেমবল্লভ বলে—লেকিন যানে তো হোগা। উ মালগাড়ি আনেসে গার্ড সাহেবকে বলো জী।

হোঁৎকা বলে—ও হই যাইবো পটলার জামাইবাবু বাদাম পাহাড়ের স্টেশন মাস্টার। ওর নাম কইনা, দেখবা গার্ড সাহেব খাতির কইরা উঠাই লইবো টেনে।

কিন্তু সেই মালগাড়ির এখনও খবর নেই।



স্টেশন মাস্টার-এর কাছে খোঁজ নিতে গেলে মাস্টার মশায় টরে টক্কা বাজাতে বাজাতে বলে—মালগাড়ির আবার টাইম থাকে নাকি হে ছোকরা? বোম্বে মেল—গীতাঞ্জলিরই টাইম থাকে না! কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

অর্থাৎ মালগাড়ির টাইম জিজ্ঞাসা করে নাকি অতীব মূর্খতার পরিচয় দিয়েছি আমরা! স্টেশন মাস্টার নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে বলে—বসো গে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবে বোধহয়।

পেটের মধ্যে তখন খোলকর্তাল বাজাতে শুরু হয়েছে। গজরায়—কাল রাতে সব সাফ করলি, এখন খা কি খাবি? কখন পৌঁছবি তারও ঠিক নেই।

স্টেশনের ওদিকে হঠাৎ হোঁৎকাকে দেখে চাইলাম। হোঁৎকা এর মধ্যে সেই জামাই প্রেমবল্লভের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। প্রেমবল্লভও কলকাতাতে থাকে, নতুন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সঙ্গের টিফিন কেরিয়ার খুলে বসেছে। হোঁৎকাই এখন পরিবেশন করছে।

খাঁটি ঘিয়ের আলু পরটা, মশলাদার আলুর দম, আচার, তৎসহ ঘিয়ের বেশ জব্বর সাইজের লাড্ডু। খিদের সময় এসব যেন অমৃত বোধ হয়। প্রেমবল্লভ বলে—হোঁৎকাজী আউর পরোটা লেও, আলুকা সবজি ভি বহুৎ হ্যায়!

হোঁৎকা বাক্যব্যয় না করে তখন সমানে পরোটার সদ্গতি করে চলেছে। বেশ যুৎসই করে লোডিং করে টিফিন কেরিয়ার সাফ করে হোঁৎকা এবার দম নিয়ে বলে—না! বেরেকফাস্টখান ভালোই হইছে। একখালি পান অর্গানাইজ করে দে গোবরা!

হোঁৎকা তৎসহ বেশ কিছুটা জল গিলে এবার আহার শেষ করে বসেছে প্ল্যাটফর্মে, মালগাড়ি আসুক না আসুক, তার জন্য ওর কোন মাথাব্যথাই নেই। যেন এইখানেই ঈষৎ নিদ্রা দিতে পারলে বাঁচে। ক্রমশ প্ল্যাটফর্মেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো।

পটলা বলে—গার্ড সাহেবকে বুঝিয়ে বলে এতেই যেতে হবে।

আমরাও তাই ভাবছি। পটলা বলে—জামাইবাবুর নাম করলেই রাজী হবে।

মালগাড়িতে মালপত্র বয়, তাই জানতাম। কিন্তু এই লাইনের মালগাড়িগুলো খালিই যায় বাদাম পাহাড় অবধি, সেখানে থেকে ওয়াগনবন্দী লোহা-পাথর আসে জামশেদপুর-দুর্গাপুর-বার্নপুরের লোহা কারখানায়।

তাই গাড়িগুলো এখন খালিই যাচ্ছে, মালপত্র নেই। কিন্তু মাল না থাকুক, লোকজন যাত্রীর অভাব মালগাড়িতে নেই। আশ-পাশের হাটে যাবার জন্য ব্যাপারীরা—লোকজন উঠেছে, ছাগল-ভেড়া-মুরগী-তরিতরকারির ঝুড়ি নিয়ে চলেছে লোকজন, এমনি যাত্রীও আছে। লোকভর্তি মালগাড়ি।

তাই বলি—গার্ড সাহেব ওদের নিয়ে চলেছে, আমাদেরও নেবে নিশ্চয়!

পটলাও গিয়ে বলে তাকে। তার ভগ্নীপতি যে স্টেশন মাস্টার তাও জানায়। গার্ড সাহেব তখন ব্যস্ত। ওর সঙ্গে একজন চ্যালাও রয়েছে।

পেটমোটা গার্ড সাহেব—বিশাল জালার মত পেট। গ্যালিস দেওয়া একটা প্যাণ্ট কোনরকমে গেঞ্জির উপর কাঁধ থেকে ঝুলছে মাত্র। কালো হাঁড়ির মত মুখখানা।

পটলার কথায় গাঁক গাঁক করে ওঠে—হোয়াট? আই ক্যারি নো প্যাসেঞ্জার।

আমি দেখছি ওর ব্যাপারটা।

এর মধ্যে গার্ড সাহেবের সেই টিকটিকে লগার মত লম্বা চ্যালাটা প্রতি মালগাড়ির লোকজনের কাছ থেকে টাকা আদায় করে চলেছে। ট্রেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আট আনা-এক টাকা, দুই টাকা করে চার্জও করে চলেছে। আর এ টাকা যে ওই পেটমোটা গার্ডের পেটে ঢুকবে তাও বুঝেছি। বেশ মোটা টাকাই তুলেছে চ্যালাটা।



আমি আড়ালে বলি—ও ব্যাটা টাকা ছাড়া তুলবে না পটলা। টাকা নেবে।

পটলা ঘাবড়ে যায়—এ্যাঁ, ফাণ্ড যে শর্ট রে!

ওদিকে প্রেমবল্লভ শ্বশুরবাড়ির জন্য ছটফট করছে।

সে শুধোয়—কিতনা লেগা?

আমি জানাই—তা ছ'জনের জন্যে বার পনের টাকা তো নেবেই।

হোঁৎকা অবাক হয়। তার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় প্ল্যাটফর্মের গাছের নীচে শুয়েছিল, তখন দু চারটে কাকপক্ষীতে বিষ্ঠাত্যাগও করেছে। তারই কিছুটা তখনও হোঁৎকার কপালে তিলকের মত লেগে আছে। জামাপ্যাণ্টেও লেগেছে।

হোঁৎকা সেগুলো মুছতে মুছতে গজরায়—এ্যাঁ! পটলা, তর বোনাই রেলের লোক—তর কাছেও টাকা চায় ওই ভোট্‌কা গার্ড সাহেব? হালায় রেল কোম্পানীকে ঠকাইত্যাছে? ডিসঅনেস্ট—

আমি থামিয়ে দিই, ওসব এখন রাখ। টাকা না দিলে গাড়িতে তুলবে না। পড়ে থাকতে হবে সারাদিন। খেতেও পাবি না।

একটা সমস্যা বটে। প্রেমবল্লভের রসদও শেষ। এখানেও কিছু মিলবে না। হোঁৎকা ঘাবড়ে গিয়ে বলে—তয় একটা কিছু কর।

গোবরা এসব দরদাম ব্যবসার ব্যাপারে পটু। মামার দোকান আড়তে বসে এসব কিছুটা শিখেছে। গোবরাই বলে—দেখছি আমি গার্ড সাহেবকে।

গোবরা গিয়ে মোটকা হাঁড়িমুখো গার্ড সাহেবকে সেলাম করে দাঁড়িয়েছে।

হোঁৎকা গর্জায়—হালায় ঘুষখোরটারে দেখুম একবার। তর জামাইবাবুর নাম শুইনাও বলে নিমু না ট্রেনে। ইংরাজী কয়—

গোবরা অবশ্য এর মধ্যে দরদাম করে বারটাকায় রফা করেছে।

আরও স্পেশাল খাতিরও আদায় করেছে দু টাকা বেশি দেবার কথা বলে।

ওই ফাঁকা মালগাড়িতে গেলে বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ও আছে, কারণ যখন তখন দু একপশলা বৃষ্টি হচ্ছে। গার্ডসাহেব দয়া করে আমাদের ওর কেবিনেই যেতে দেবে।

হোঁৎকা গজরায়, পনেরো টাকা লাগবো? উঃ, পুরা টিকিটের দামের উপর এত টাকা লস, হালায় হক্কলেই চোর হইছে। বুঝলি! চল, দেহি তোর বাদাম পাহাড়ই। বনেবাদাড়ে আর যামু না, হালায় চোরের রাজত্বি!

গজগজ করতে করতে গার্ডের কেবিনেই উঠলাম, তখন খেয়াল হয় বেলা প্রায় বারটা বেজে গেছে। গার্ড সাহেব আর তার চ্যালা ততক্ষণে লাঞ্চ করতে বসেছে।

ইয়া একটা টিফিন কেরিয়ার খুলে দিস্তা খানেক রুটি, কিছু ভেণ্ডি ভাজা আর গোবদা-গাবদা সাইজের মুরগীর ঠ্যাং-এর রোস্ট নিয়ে বসেছে, তখনও টিফিন কেরিয়ারে মজুত রয়েছে কেজিখানেক মুরগীর রোস্ট।

সেটা বন্ধ করে ওরা দুজনে আরাম করে মুরগীর ঠ্যাং চিবিয়ে চলেছে। আমাদের মালপত্র নিয়ে কেবিনে উঠতে দেখে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, গিভ দি মানি।

অর্থাৎ টাকাটা আগাম দিতে হবে। পটলা-প্রেমবল্লভ দুজনে হারাহারি করে পনের টাকা দিতে নোটগুলো দেখে নিয়ে বোদলা মার্কা পকেটে চালান করে আবার মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে থাকে।

হোঁৎকার দৃষ্টি নিবদ্ধ ওই মুরগীর ঠ্যাং ভর্তি টিফিন কেরিয়ারের দিকে, রান্নাটা ভালোই করেছে সাহেবের বৌ, বেশ সুঘ্রাণ উঠছে। এতক্ষণে টের পাই পাহাড় অঞ্চলের জলের দরুন প্রেমবল্লভের আস্‌লি ঘিয়ের আলু-পরোটা-লাড্ডু কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

ওই রুটি-মুরগীর মাংস দেখে খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। ভেবেছিলাম



সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেও মুখ ফুটে বলবে কিছু খেতে, কিন্তু যে গার্ড দালাল লাগিয়ে এইভাবে দৈনিক কয়েক শো টাকা বে-আইনীভাবে রোজগার করে, তার সামান্য এই চক্ষুলজ্জা থাকার কথা নয়। তাই ওসব ভদ্রতার ধারে কাছেও যায় না সে। উল্টে খাওয়া-দাওয়ার পর শুধোয় আমাদের—সিগ্রেট আছে? এনি সিগ্রেট?

নেশাটাও পরের পয়সায় সারতে চায়! হোঁৎকা বলে, নো সিগ্রেট। আমরা ওসব খাই না।

কে জানে গাড়ি থেকে নামিয়েই দেবে কিনা, সেই ভয়েই ওই জামাইবাবু প্রেমবল্লভ বলে, এই যে—

এক প্যাকেট দামী সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দেয় ওর দিকে। মোটকা গার্ড সাহেব সিগ্রেটের বাক্স থেকে একটা সিগ্রেট বের করে ধরিয়ে পুরো প্যাকেটটা পকেটস্থ করে হোঁৎকাকে বলে—ট্রেন ছাড়বো এখুনিই, তার আগে ব্রিং সাম পান—পান লে আও দুকানসে। জলদি ম্যান।

যেন চাকর-বাকরই পেয়েছে আমাদের। কিন্তু উপায় নেই, বাধ্য হয়েই বলি—চল হোঁৎকা, পান নিয়ে আসি।

হোঁৎকা চলেছে, তবু গজগজ করে সে, হালারে দেইখা লমু। খুবই কাতে পড়ছি এহন?

মালগাড়ির বিরাট দেহটা এবার নড়ে চড়ে উঠেছে। চলেছে গাড়িটা বাদাম পাহাড়ের দিকে।

কিন্তু চলা ওই নামেই। টাকা দেওয়া যাত্রীদল এখান ওখানে তাদের গাঁ বসতি দেখে দুই ওয়াগনের মধ্যেকার ভ্যাকুয়াম পাইপ ঠিক খুলে ফেলেছে বলে থেমে যাচ্ছে গাড়ি, ওরা নামছে যেখানে সেখানে। আবার এরা পাইপ জোড়া লাগিয়ে গাড়ি নিয়ে চলেছে।

শুধোই—কখন বাদাম পাহাড় পৌঁছাবো?

গার্ড সাহেব তখনও লোক তুলছে, তোলা আদায় করছে। প্যাণ্টের পকেট উপচে কুঁচো নোট জমছে। আমার কথায় বলে—দ্যাট আই নট নো।

অর্থাৎ তা তিনি জানেন না। লেট হলেও তাঁর বাণিজ্য ঠিক চলছে। এই লাইন যেন তাঁর জমিদারিই।

হঠাৎ গার্ড সাহেব কিছুক্ষণ পর বলে এখন নো ওয়ার্ক। তাস খেলতে জানো ইউ বাবুজ? লেট আস প্লে কার্ডস। এখনও ঘণ্টা দেড়েক লাগবে বাদাম পাহাড় পৌঁছতে।

এবার বন পাহাড়-এর ঘনত্ব বেড়েছে। লোকজন-এর আমদানি নেই এই অঞ্চলে, বাণিজ্য যা হবার হয়ে গেছে। এবার তিনি চিত্ত-বিনোদন করতে চান।

তাস—অকসন ব্রিজের খেলায় হোঁৎকা-গোবরা অতীব পারদর্শী। এর মধ্যে ব্রিজ কমপিটিশনে ওরা প্রাইজ হিসেবে সুটকেস ফ্লাস্কও জিতেছে।

সুতরাং কি ভেবে বলে গোবরা—খুব ভালো খেলা তো জানি না।

হোঁৎকাও জানায়—কোনমতে ঠ্যাকা দিতি পারি মাত্র।

গার্ড সাহেব বলে—দ্যাট উইল ডু। তবে বাজী রেখে খেলতে হবে কিন্তু। জিতলে তোমরা পাবে, হারলে আমাকে দিতে হবে টাকা। পার পয়েন্ট ফাইভ পয়সা—

গোবরা কি ভাবছে।

মোটকা গার্ডের চ্যালা বলে—না হলে তিন নম্বর খোলা গাড়িতে যেতে হবে, ওখানে দু তিনজন তাস খেলছে, ওদেরই ডেকে আনবো।

চমকে উঠি। বৃষ্টি পড়ছে। এ সময় আমাদের খোলা মালগাড়িতে পাঠিয়ে দেবে তাস না খেললে। আর হারলেও বিপদ। পয়সাকড়ি যা আছে, সব চলে যাবে। যেন ডাকাতের পাল্লাতেই পড়েছি!

ভাবছি আমরা।

প্রেমবল্লভ বলে—ঠিক হ্যায়! গোবর্ধন ভাইয়া, বৈঠ যাও। ফিকির মৎ করো। ইয়ে রাখ বিশ রুপেয়া। খেলো—

কুড়ি টাকা বের করে রাখে গার্ড সাহেবের কাঠের বাক্সের উপর। খেলা শুরু হয়।



মোটকা গার্ড আর তস্য চামচে সেই ফিট্‌কে একদিকে, অন্যদিকে আমাদের টিম—হোঁৎকা আর গোবরা।

তাসের কিছুই বুঝি না, তবু দেখছি ওদের খেলা।

ক্রমশ হোঁৎকা-গোবরা দানের পর দান জিতছে, আর প্রেমবল্লভ হিসাব কষছে। তিনশো বাইশ পয়েন্ট, চারশো।

মালগাড়ি চলছে, এদিকে খেলাও চলছে।

বৈকাল নামে পাহাড় বনে। এবার টনক নড়ে গার্ড সাহেবের, বাদাম পাহাড় স্টেশন আসছে। তখন হিসাবমত হোঁৎকা-গোবরার টিম জিতেছে প্রায় ছশো পয়েন্ট। অর্থাৎ ছশো ইনটু পাঁচ পয়সা অর্থাৎ প্রায় তিরিশ টাকা জিতেছে হোঁৎকারা। প্রেমবল্লভের কুড়ি-টাকায় হাত পড়েনি, উল্টে তিরিশ টাকা জিতেছে।

গার্ডসাহেব এতাবধিকাল শুধু টাকা আদায় করে পকেট বোঝাই করেছে, কিন্তু এবার সেই পকেট থেকে কিঞ্চিৎ দিতে হবে কথাটা ভেবে বলে—ইউ ম্যান, দ্যাট ওয়াজ এ জোক! ঠাট্টা করেছিলাম। তাস খেলছিলাম অনলি কিল টাইম। সময় কাটাবার জন্যে।

ওর কথা শুনে অবাক হই।

তখন টাকা বাজী না রেখে খেলার জন্য ফাঁকা মালগাড়িতেই চালান করছিল! আর অন্যায়ভাবে এত লোকের টাকা কেড়েছে ট্রেনে চাপিয়ে, আমাদেরও।

বাদাম পাহাড় স্টেশনও কাছে এসে গেছে। এবার আমরাও জোর পাই।

হোঁৎকা রেগেই ছিল, এবার বলে সে—রসিকতা পাইছ, এ্যাঁ? তহন তো কইলা বাজী না রাইখা খেলতে পারবা না, গাড়ি থনে নামাই দিবা, এহন কও রসিকতা? তালি-বালি চলবো না চাঁদ—ট্যাকা বার করো—তিরিশ ট্যাকা।

চামচেটা কি বলার চেষ্টা করতে গোবরা গর্জে ওঠে—চুপ করো। তোমার দালালি ছুটিয়ে দেব। কত টাকা রোজ ঘুষ খাও, সব বলে দেব, হাতে-নাতে ধরিয়ে দেব তোমাদের।

গার্ড সাহেব চাইল আমাদের দিকে।

হোঁৎকা বলে—বাদাম পাহাড়-এর স্টেশন মাষ্টার নরেশবাবুর কাছেই ধরে নিয়ে যাবো! পকেট ভর্তি টাকা কোথায় পেলে, এবার জানবে রেল কোম্পানি!

গার্ড সাহেব এমন বিদ্রোহী যাত্রীদল কখনও পায়নি। পকেট থেকে দলা পাকানো টাকার থেকে তিরিশ টাকা বের করে বলে—টেক বাবা!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—নো! জুয়া খেলে টাকা রোজগার করি না। বাদাম পাহাড় পৌঁছলে সব যাত্রীর ওই দু টাকা হারে টাকা ফেরত দিতে হবে। আগে যা করছে করেছ, এহন ছাড়ুম না তোমায়! না হলে চলো স্টেশনে—

মোটকা গার্ড সাহেব এবার আর্তনাদ করে ওঠে—হোয়াট! রূপয়া ওয়াপস দেনে হোগা? রিটার্ন করতে হবে?

হোঁৎকা এখন ফুল ফর্মে। মালগাড়িটা বাদাম পাহাড় স্টেশনের আউটার সিগন্যাল পার হয়ে স্টেশনের দিকে চলেছে। হোঁৎকা বলে—হঃ, দিবার লাগবো, নয়তো মজা দেখাইমু।

মোটকা গার্ড-এর কপাল ঘামছে। এমন বিপদে বোধহয় কখনও পড়েনি। আর্তনাদ করে—মাই গড!

যাত্রীরাও সেদিন টাকা ফেরত পেয়ে অবাক হয়। আর পটলার জামাইবাবু বলেন—সত্যি ওই বেঞ্জামিন-এর নামে অনেক কথাই শুনেছি! তবু তোমরা ওকে শায়েস্তা করেছ।

পটলা বলে—অন্যায় স-সহ্য করি না আমরা।

হোঁৎকা অবশ্য চুপ করেই থাকে। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে না সে।



www.arisumu.com

## পটলের মুক্তিপণ

ক্লাবের সমস্যার সমাধান আর হবে না কোনো-দিন, একটা না একটা ফ্যাচাং লেগেই আছে। ফুটবল সিজন গেল তো এল ক্রিকেট সিজন, তারপর বিজয়া দশমী, সাংস্কৃতিক উৎসব, সরস্বতী পূজো, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। টুকটাক লেগেই আছে। আর ঘটাও বাড়ছে। বলি—ক্লাব তুলে দে!

হোঁৎকা দেশজ ভাষায় বলে—তুইলা দিলেই হইব? বাজারে দেনা কত জানস?

গোবর্ধন ইদানীং মামার আড়তে পাইকারী হারে কুমড়ো বেচে কুমড়োর মতো হয়ে উঠেছে। সে বলে কুলে পাড়ার ওরা প্যাঁক দেবে।

পটলা এই ক্লাবের কামধেনু-কাম-সেক্রেটারী। সে ইদানীং কিঞ্চিৎ বেদ উপন্যাস পড়ছে। পটলার জ্ঞান অর্জনের খুবই আগ্রহ। পয়সা ওর বাবা কাকারা প্রচুর রোজগার করে। তাই পটলার পয়সার দরকার নেই। বলে জ্ঞানই পরমার্থ। এ হেন পটলা বলে—চরৈবেতি। অথাৎ চলতে থাকো।

ফটিক তখনও তার তিন নম্বর কেলোয়াতি গানের মুখড়া রেওয়াজ করে চলেছে—মেরে সঁইয়া—

জানাই—সব তো জানলাম। সামনে ফুটবল সিজন। প্লেয়ার সাজলেই বলে প্যান্টপিস, জুতো-জামা চাই, বুট চাই—ট্যাক্সিভাড়া বাবদ কত যাবে জানিস। খেলবে তো চ্যাড়স।

পটলা উত্তেজিত হলে বিপদ। জিবটা এখনও আলটাকরায় সেট হয়ে যায়। বলে সে—ময়দানের তাবড় ক্লাবে কি হচ্ছে? গণ্ডা গণ্ডা গোল খেয়ে আসছে। তা তারাই ক-কতো চায় জানিস! আশি হাজার এ—এক লাখ—।

—পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব কোত্থেকে দেবে?

হোঁৎকা বলে—তয় টিম তুইলা দিবি! তার আগে আমি রিজিকনাশন দিমু। ওর পকেটে একটা পদত্যাগপত্র লেখাই থাকে রেডিমেড।

ফটিক বলে—'জলসা' ক্লাব তো ডাকাডাকি করছে। ওদের নেক্সট প্রোগ্রামে চান্স দেবে খেয়াল গাইতে।

বলে উঠি—তারপর ডাক্তারী খরচা দেবে তো! মাথা ফাটবে নির্ঘাৎ গাইতে বসে।

ফটিক গর্জে ওঠে—ওরে থামতে বল হোঁৎকা, নাহলে সমীর-এর মাথাই ফাটাব। আমার গানের 'ক্রিটিসিজম' করবে?

পটলাই থামায়, ঝালমুড়িওয়ালাকে বলে—পাঁচ জায়গায় দাও।

বাজেট বের করি। দেখা যায়, টিম করতে, জিনিসপত্র কিনতে, খেলা চালাতে প্রায় কুড়ি হাজার পড়বে। ফাণ্ডে তো কিছুই নাই।



ট্রেজারার হোঁৎকা বলে—আজকের ঝালমুড়ির খরচা দিলেই নীল ব্যালেন্স হই যাইব।

সমস্যায় পড়েছি। আর এ সমস্যার সমাধানের জন্য মুড়ি, তার উপর আইসক্রীম, ফুচকা উইথ আলুকাবলী দিয়েও সমাধান হলো না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামে। কুড়ি হাজার তারাই দেখলাম আকাশে, একটা টাকার দেখা মিলল না। হোঁৎকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—তয় ক্লাব বন্ধই কইরা দে।

পটলা বলে ওঠে—নো—নেভার। ব-ব-ব……

চাইলাম ওর দিকে। পটলা ততক্ষণে 'ফ্রি' করেছে জিবটাকে। বলে সে—বন্ধ হবে না। টাকার ব্যবস্থা হবে। অনেক টাকাই পাবি। ধর পঞ্চাশ হাজার।

বলে উঠি—তাহলে তো দরমার বেড়া তুলে পাকাবাড়ি হবে!

হোঁৎকা ধমকে ওঠে—চুপ মাইরা থাক। ক্লাব পাকা কইরা দেব আলিকান কোম্পানী। হে পথ কইরা রাখছি, ওগোর যাইবার পথ এখান হইতে হইব। দিমু না—তয় ওরা কইছে ক্লাবঘর কইরা দিমু, পথ দাও।

পাকা ক্লাব হবে। তাই বলি—তাহলে ব্যাঙ্কে রাখলে সুদ পাব!

গোবর্ধন বলে—তার চেয়ে সিজনে কুমড়ো কেন পাইকেরীতে।

হোঁৎকা ধমকে ওঠে—চুপ কইরা থাক কুমড়ার ভাগ্নে! এখন টাকাটা আইতে দে—

পটলা বলে—এসে যাবে, শুধু একটু রেডি থাকবি। যা বলছি শোন—

এবার মন দিয়ে শুনি ওর প্ল্যানটা। বেশ জব্বর প্ল্যান—পঞ্চাশ হাজার এসে যাবে। হোঁৎকা বলে—যদি কেলো হই যায়?

ফটিক অভয় দেয়—কোনো ভয় নাই। ক'টা দিন অভিনয় করে যাবি। একবার কানা বিশেকে খবর দে। বাহাদুরকে ডেকে দেবে। তাকেও কিছু দিতে হবে। আর মড়ার মাথা, হাড় এসব দিয়ে

লাল কালিতে চিঠি একটা লেখাতে হবে। হাতের লেখা কেউ চিনবে না।

হোঁৎকা বলে—তয় ভাবিসনি—আমার হাতের লিখা আমি নিজেই হালায় চিনতি পারি না। সকালে বিকালে বদল হই যায়। ওসব লিখা দিমু।

প্ল্যানটা হয়ে যায়। আমি বলি—এসব করবি! না—না—

ধমকে ওঠে হোঁৎকা—ক্লাবের জন্যি পটলা এত বড় স্যাকরিফাইস করত্যাছে—আর তুই গুবলেট কইরা দিবি! মার্ডার করুম তোরে সমী—

তাই ভয়েই চেপে যাই।

পরদিন থেকেই যে যার কাজে রয়েছি; ক্লাবে এসে জমেছি সন্ধ্যার মুখে। ছুটে আসে পটলাদের বাড়ির বাচ্চা চাকর নকুল। পটলার এই আস্তানার খবর সে জানে। নকুল বলে—সকাল থেকে দাদাবাবুর খবর নাই, এখনও বাড়ি ফেরেনি। ঠাকমা তোমাদের এখুনি যেতে বলেছে।

ডাক আসবে তা আমরাও জানতাম। তবু ভয় হয়। এ ওর দিকে চাই হোঁৎকা বলে—এঁ্যা! পটলার পাত্তা নাই! যাইত্যাছি।

পটলার বাড়িতে তখন হৈচৈ পড়ে গেছে। টেবিলের চারিদিকে ওর বাবা-কাকারা-গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঠাকমা কাঁদছে—একি সর্বনাশ হলো রে!

পটলার মায়ের চোখে জল।

আমাদের ঢুকতে দেখে ঠাকমা ডুকরে কেঁদে ওঠে। ঠাকমা আমাদের বিশ্বাস করে। এর আগে পটলচন্দ্রকে বহু বিপদ থেকে আমরাই উদ্ধার করে এনেছি। ঠাকমা বলে—ছাখ, তোদের পটলকে এবার কোন দলই শেষ না করে! কি লিখেছে ছাখ।

লাল কালিতে মড়ার মাথার খুলি আড়াআড়ি হাড় দেওয়া। লেখাটা পড়ি আবার—মুক্তিপণ চাই—পঞ্চাশ হাজার টাকা। কাল



সন্ধ্যার সময় ধাপার খালের ধারে টাকাটা পৌঁছে দিলে পটলকে পাইবেন—নতুবা তার প্রাণসংশয়। ইতি—'কালোভোমরা।'

পুঃ পুলিসে খবর দিলে পটলাকে হত্যা করিব।

রাঙ্গা কাকাবাবু বলে—পুলিসেই খবর দিই।

ঠাকমা বলে ওঠে—ছেলেটাকে মারতে চাস তোরা? তার চেয়ে যা বলেছে তাই কর্। পঞ্চাশ হাজার টাকা বড় না পটলা?

হোঁৎকা বলে—আমাগোর ট্যাকা থাকলি ট্যাকাই দিয়ে দিতাম!

ফটিক বলে—কি করছে পটলা কে জানে!

ঠাকমা কাঁদে—খেতে পেল কিনা কে জানে! ওরে ট্যাকাই দে।

ছোট কাকা বলে—গুণ্ডাদের সিধে করব। কিডন্যাপ করা বের করে দেব।

হোঁৎকা বলে—কাল আমরাও খুঁজছি, পটলার কোনো ক্ষতি হইতে দিমু না।

আমিও বলি—হ্যাঁ, ঠাকমা।

পোড়ো বাগানবাড়িটার এদিকে বড় একটা কেউ আসে না। নতুন মালিক গোবর্ধনের কুমড়ো মামা। শ্রেফ কুমড়ো আর আলু বেচে এই বিরাট বাগান উইথ বাড়ি কিনেছে। বাড়িটা ভেঙে নতুন বাড়ি বানাবে। ততদিন উপরে নিচে কুমড়োর গুদাম—আলুর বস্তা রেখেছে। আর বাহাদুর এখানে থেকে পাহারা দেয়।

মোমবাতির আলোয় ঘরটা রহস্যময় দেখায়। আলুর বস্তা সরিয়ে চারপাই কয়েকটা এনেছে বাহাদুর। সে-ই রান্না করেছে চাপাটি আর মুরগীর মাংস, সঙ্গে ফ্রি আলু-কুমড়োর ছক্কা।

পটলা এখন এখানেই আত্মগোপন করে আছে। আর মুক্তিপণ দাবী করেছে সেই কালোভোমরার দল। হোঁৎকা বলে—তর ঠাকুমা তো ট্যাকা দিতি চায়।

আমি বলি—কিন্তু রাঙ্গা কাকা ছোটকা রাজী নয়, পুলিসে যাবে।

পটলা বলে, খবর রাখবি, পুলিস এখানের সন্ধান যেন না পায়।

গোবর্ধন বলে—জানতে পারলে মামা আমাকেই কুমড়োপটাশ করে দেবে।

হোঁৎকা বলে—সায়লেট থাকবি।

এদিকে আমরাও খবর রাখছি পটলার হেড-কোয়ার্টারের মুভমেণ্টের। ঠাক্‌মার নিষেধ সত্ত্বেও ছোট কাকা, রাঙ্গা কাকা টাকা নিয়ে ওদের গাড়িতে পুলিস সাহেবকে নিয়ে গেছে ধাপার জলার ধারে তেঁতুলতলায়। পুলিশও বন্দুক নিয়ে তৈরি। এদিক-ওদিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে কালোভোমরার দলের উপর।

কিন্তু কোথায় কালোভোমরার দল, ওরা মশার কামড়ে অস্থির হয়ে পড়ে। রাঙ্গা কাকা আর মোটকা পুলিশ সাহেব তো ভেড়ি বাঁধের উপর মশার কামড়ে ভারতনাট্যম শুরু করেছে। ঘণ্টাখানেক নেচেকুঁদে গালে চড়-থাপ্পড় মেরে মশার কামড়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে এলো। পটলার কোনো খবর নেই—ঠাক্‌মা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আমরা তখন চিংড়ির কাটলেট খেতে ব্যস্ত কুমড়োর গাদায় বসে।

পটলা বলে—টাকা না পেলে যাবই না। মুক্তিপণ চাই—পঞ্চাশ হাজার। যা ছাখগে এখন কি প্ল্যান হচ্ছে।

পুলিস সাহেব আবার সকালে পটলাদের বাড়িতে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। এই অঞ্চলের পুরোনো বাড়িতে রেড করার কথাও ভাবছে। রেডিও, টি ভি-তেও ঘোষণা করা হবে। ছোট কাকু এর মধ্যে খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেবার কথা ভাবছে। আর ঠাক্‌মা, পটলার মাকে দেখে কষ্ট হয়! নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে। ঠাক্‌মা বলে আমাদের—যেখানে পাস খুঁজে আন ভাই, ওই টাকা তোদেরই দেব। তোদের ক্লাবকে দেব।

ভাবছি কথাটা। এখন জাল গোটাতে হবে।



এদিকে কাণ্ড বেধে গেছে। গোবর্ধনের কুমড়োমামা ইদানীং আরব দেশে কুমড়ো পাচার করছে ভালো দামে। বিরাট অর্ডার এসেছে কয়েক টন কুমড়োর। তাই দুপুরে এক ফাঁকে নিজেই গেছে কুমড়োর স্টক দেখতে।

কুমড়ো গুনতি করছে একাই।

সুনসান চারদিক। টালবন্দী কুমড়ো সাজানো। পটলা ওরই মধ্যে চাদর চাপা দিয়ে ঘুমুচ্ছে। বাহাদুরও নিচে। কুমড়োমামা সেকেলে গেঁইয়া লোক। কুমড়োর দয়ায় বড়লোক। কিন্তু এই ভূতুড়ে বাড়িতে সে বড় একটা আসে না। আজ এসেছে—কুমড়ো গুনছে আর রামনাম করছে। কারণ এ বাড়িতে নাকি অনেক ভূতই আছে। রকমারি ভূত।

কুমড়ো গুনছে—মেজেতে হঠাৎ একটা জালি কুমড়ো যেন জীবন্ত হয়ে তার দিকে চোখ মেলে চাইছে। পটলা শুয়েছিল, তার ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ মেলতেই চোখাচোখি হয়ে যায় কুমড়োমামার সঙ্গে। মামা তো কুমড়ো ছাড়া কিছুই জানে না। সেই কুমড়োকে চোখ মেলে চাইতে দেখে নির্জন দুপুরে মামার বিশাল কুমড়োর মতো মুখটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে—লাফ দিয়ে নামতে যাবে, পায়ে লেগে ছাদ অবধি তোলা ছোট-বড় মাঝারি নানা সাইজের কুমড়ো জল-প্রপাতের বেগে এসে পড়ে মামার ঘাড়ে—কুমড়োর সঙ্গে গড়াতে গড়াতে মামা দোতলা থেকে একতলায় এসে পড়েই বেহুঁশ হয়ে যায়। বাহাদুর মালিককে কুমড়োর তলা থেকে বের করে বাড়িতে আনে।

ডাক্তার আসে, মামা বিড়বিড় করছে—কুমড়ো ভূত—ইয়া চোখ—ভূ-ভূ—

ডাক্তার ওকে ঘুমের ওষুধ আর মাথায় আইস ব্যাগ দিয়া রেখেছে

বিকেলে আসতেই দেখি সারা বাড়িতে কুমড়ো গড়ানো। ঘর-বারান্দা-উঠোনে কুমড়ো। গোবর্ধন ছুটে আসে। বলে—মামা বোধহয় পটলাকে দেখে ফেলেছে।

চমকে উঠি—সর্বনাশ হবে কাউকে বলে দিলে!

হোঁৎকা শুধোয়—মামা কোথায়?

গোবর্ধন বলে—বিছানায়। বেহুঁশ—মাথায় বরফ দিয়ে পড়ে আছে!

বলি—হুঁশ ফিরলেই বিপদ বাধবে। তার আগেই সরে যেতে হবে পটলা।

হোঁৎকা বলে—হুঁ। ঠাক্‌মা কইছে পটলারে লই যাইতে পারলি টেকাটা আমরাই পাব।

—যদি ধরা পড়ি! জানাই আমি।

ভাবছি কি করে এবার শেষ রক্ষা করা যায়। ওদিকে পুলিসের গাড়িও ঘুরছে। তারাও খোঁজ করছে; বলি—পটলা, তোর জন্য ফেঁসে না যাই! এক একটা কাণ্ড করবি, এখন সামলাই কি করে! তার চেয়ে তুই বাপু পুলিশেই যা।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তর যা বুদ্ধি। স্কুলে ফার্স্ট হোস কি কইরা? ও পুলিসে গেলে হেই দারোগা পাইব পঞ্চাশ হাজার। তুই কচু পাবি, ফুটবল টিম হইব?

তা সত্যি!

পটলার ঠাক্‌মা কদিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে। মায়ের অবস্থাও তেমনি ছোট কাকা-রাঙ্গা কাকার দাপটও কমেছে। ক'দিন ঘুরে বুঝছে মুক্তিপণ দিয়েও ভাইপোকে পাওয়া যাবে না। সারাবাড়িতে শোকের ছায়া নেমেছে স্তব্ধ বাড়িটা।

ট্যাক্সিটা এসে থামলো বাড়ির গাড়ি বারান্দায়। হঠাৎ পটলার বাবার আমাদের দিকে নজর যেতে চাইলেন। ঠাক্‌মাও ছুটে আসে। পটলা যেন হাঁটতে পারছে না—নড়তে-চড়তে গেলে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর আমাদের কারো হাতে ক্ষত, হোঁৎকার কপালে রক্ত ঝরছে। গোবরার গালে কাটার দাগ-হাঁটতে পারছে না!



তবু বলি—ঠাক্‌মা, পটলাকে এনেছি।

হোঁৎকা বলে—ফাইট করছি জান কবুল কইরা! লই যান পটলারে।

ওর বাবা বলে—তোমাদেরও চোট লেগেছে!

হোঁৎকা তার আগে আমাদের ঠেলে গাড়িতে তুলেছে। বলে সে—এডা ত্যামন কিছুই নয় কালোভোমরা Party কে বুঝাই দিইছি। চলি ঠাক্‌মা।

ক্লাবে নেমে জল-নারকেল তেলটেল দিয়ে রক্তের দাগটাগ তুলে সাফ হই। হোঁৎকা বলে—বুঝতে পারে নাই তো রে!

ব্যাপারটা কোনোরকমে সামলে গেছি। এবার ফুটবল টিম যা হয়েছে ক্লাবের, দারুন। ঠাক্‌মা তাঁর কথা রেখেছেন। এবার শিল্ড তুলবই। তবে তার পিছনের ইতিহাসটা কেউ কোনোদিন জানবে না।

—

www.arisumu.com

পটলা ইদানিং নাটক নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। পটলা বলে—ন-নাটকই স্-সমাজের দর্পণ। বুঝলি? নাটকের উন্নতি করা দ-দ—

পটলার আবেগ চাপলে ওর জিবটা আলটাকরায় আটকে যায়। হোঁৎকা বলে—ব্রেক ফেল করেছে ওর!



ফটিক অবশ্য কালোয়াতি গান নিয়ে থাকে। তিন বছর ধরে মাত্র তিনখানা গান নিয়েই এন্তার বমি করে চলেছে। বলে—রাগ-রাগিণীর ব্যাপার, সাধনার দরকার।

ইদানিং পটলার নাটকে সে সুর সংযোজনা করেছে। সুতরাং ফটিক বলে—থাম দিকি হোঁৎকা! নাটক দিয়েই এবার পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব সমাজসেবার কাজ করবে।

পটলাও বলে—সিওর!

এর মধ্যে ম্যারাপ বেঁধে পটলার নতুন নাটক 'আমরা কারা' মঞ্চস্থ হয়েছে। পটলার ছোটকাকা আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপেষক। পাড়ায় গাছে-দেওয়ালে পটলার নাটকের পোস্টার পড়েছিল। হোঁৎকাও কোনো অরিজিন্যাল বাস্তুহারার রোল করেছে খাঁটি বাঙাল ভাষায়। ওটা ছাড়া অন্য ভাষায় ওর বোল ফোটে না। দারুণ করেছিল।

আমার অভিনয়ের জন্য একটা রৌপপদক ঘোষণা করা হলো, পটলার নামে ঘোষণা করা হলো তিনখানা, অবশ্য তার একখানাও এতাবৎ হস্তগত হয়নি। ওরা কবুল করেই চুপ করে গেছে।

তবুও আমরা এবার জোর কদমে নাট্য আন্দোলনে ভিড়ে পড়েছি।

পটলা সেদিন খবরটা আনল। ওর পিসতুতো ভাই এসেছে হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুর থেকে, ওদের অজ গ্রামেও এখন নাকি রীতিমত সাংস্কৃতিক চেতনার মশাল জ্বলে উঠেছে। গ্রামের বাৎসরিক ধর্মরাজ পূজো উপলক্ষে তারা কলকাতা থেকে আমাদের নাটকের দলকে নিয়ে যেতে চায়।

পটলার 'আমরা কারা' নাটকের সুখ্যাতি তারাও শুনেছে। তাই ধেয়ে এসেছে।

হোঁৎকা বলে—হালায় অজ পাড়াগায়ে যাবি পটলা?

হোঁৎকা কলকাতেই মানুষ হয়েছে। পাড়াগ্রাম সম্বন্ধে তার একটা এলার্জি রয়ে গেছে। পটলা নাটকের জন্য ডাক পেয়ে বোধহয়

সুমেরু কুমেরুতেও চলে যাবে। সে বলে—কেন যাবি না? পল্লীর অন্ধকার ত-তমশার মাঝেও ন্-নাটকই পথ প্রদর্শন করতে প্—প্—

আমি পাদপূরণ করি—পথ দেখাতে পারে।

পটলা এবার ইংরাজীতে মন্তব্য করে—করেকট। তাই এ আমন্ত্রণ আমরা নেবই।

ফটিক বলে—নিশ্চয়ই। এ আমাদের পূণ্যবত। যেতেই হবে সেখানে।

হোঁৎকা বলে—কুন ঝামেলা হইব না তো?

পটলার পিসতুতো ভাই-এর চেহারাটা শীর্ণ, মাথাটা বেশ বড়সড়। তাতে বাবরি চুলও রয়েছে। দেখতে অনেকটা খ্যাংরা-কাঠির মাথায় আলুর দমের মতোই। নামটাও বেশ জবরদস্ত। চঞ্চলকুমার।

চঞ্চলকুমার বলে ওঠে—তাদের দেশজ বীরভূমী ভাষায়,কুন শালো কি করবেক হে? খেঁটে লাদ্নার বাড়িতে উদের পিণ্ডি চটকাই দিব না? রং চালাকি! তবে পটলা, একটো ডাংসার লিয়ে যেতে হবেক। পালার আগে দু'একটো লাচ লাগাই দিবি।

আমি বলি—নাচ! আমাদের নাটকে ওসব তো নেই। ইঙ্গিত-ধর্মী নাটক তো।

চঞ্চল বলে—লাচ কিন্তুক চাই হে! বোতল নিত্য, জিপসী লাচ, না হয় ডিস্কো লাচ চাই কিন্তুক!

পটলা বলে—হবে। ডিস্কো নাচও হবে।

চঞ্চল খুশি হয়ে বলে—তাহলে তো আর কথাই নাই। ব্যস। ওই কথাই রইল। সামনের মাসের তেরো তারিখ সকালের বাসে ইখান থেকে যেয়ে দুবরাজপুরের আগে হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুরের মোড়ে নেমে পড়বি। উখান থেকে আমরা লিয়ে যাবো। হুঁ!

যাবার গাড়িভাড়া আর ড্রেস-মেক্আপ বাবদ শ দুয়েক টাকাও দিয়ে গেল। চঞ্চল বলে—লাইট-ফাইট সিউড়ি থেকে আসবেক। ফকাস্ যা দিবক দেখে লিবি বটে পটলা। লাল, লীল, বাসন্তী রং যা চাইবি সব পাবি।



হোঁৎকা চুপ করে আছে।

চঞ্চল বলে চলেছে—আর খাওয়ন-দাওয়নও হবেক জোর—

এবার আহারের নাম শুনে হোঁৎকা একটু চঞ্চল হয়। শুধোয় সে—মাছ-মাংস থাকবো নিশ্চয়?

চঞ্চল বলে—হেঁই ছাখো? দশ বারো সেরী ঘেঁটো রুই খাওয়াবো হে। আর মাংস? একটো ইয়া খাসী রেখেছি, গাদাড়ে দিব। আর হাড়ভাঙ্গার দইও দেখবা, হাঁড়ি ফাঁটাই দাও, দই টুকবেন ও পড়বেক নাই। ত্যামন দই দিব হে।

ঘনঘন রিহার্সেল হচ্ছে। আর টেপরেকর্ডারে ডিস্কো মিউজিকের তালে তালে কানা বিশেও এবার নাচের মহড়া জোরদার করে তুলেছে।

পটলা তখন টিম নিয়ে এবার দূরপাল্লার বাসে যাবার আয়োজন করছে।

এর আগে এত দূরে অভিনয় করতে আসিনি। শালবন—অজয় নদী পার হয়ে বাসটা চলেছে, বেলা তখন প্রায় এগারোটা। কন-ডাকটার একটা মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে—হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুর মোড়। নেমে পড়ুন।

আমরা স্যুটকেস, ব্যাগ, ওদিকে সাজের বাক্স-টাক্স নিয়ে হড়বড়িয়ে নামলাম, বাসও আমাদের বাতিল মালপত্রের মতো এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের মাঠে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

একটা পুরোনো বটগাছ-এর নীচে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান মতো। বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী দুটো মাচা, ও-দুটোই বেঞ্চের কাজে লাগায় দোকানদার।

হোঁৎকা বিবর্ণ মুখে বিড়বিড় করে—ক্ষুধাপাইছে—কইল মাছ-মাংস, ভরপেট দইও দিবে। হালায় ওগোর পাত্তাই দেহি না রে পটলা!

রোদও বেড়ে উঠেছে। দেখছি এদিক ওদিকে। পটলাও বিপদে

পড়েছে। হঠাৎ তিন চারজন ছেলেকে সাইকেল নিয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখে চাইলাম। ওদেরই একজন এগিয়ে এসে শুধোয়—কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে? এ্যাঁ!

ছেলেটার গোঁফজোড়াটা বেশ জমজমাট। গলাটাও একটু কর্কশ। পটলা আশাভরে বলে—হ্যাঁ। আপনারা হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুর থেকে আসছেন? চঞ্চলদা পাঠিয়েছে?

অন্যজন বলে—উসব চলবেক নাই হে। হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুরে ঢুকবা নাই তুমরা। ইখান থেকেই পরের বাসে পানাগড় চলে যেতে হবেক।

অবাক হই—সেকি? এতদূর এলাম নাটক করতে, শেষকালে ফিরে যেতে হবে? কেন?

ছেলেটা এবার গোঁফে চাড়া দিয়ে বলে, কেনে-মেনে বুঝি না। গাঁয়ে ঢুকলে হাড় গুঁড়ো করে দোব। গাঁয়ের নামটা জানো তো?

এবার চমকে উঠি। হাড়ভাঙ্গা নামটা শুনে তখনও ঠিক বুঝিনি। এবার মনে হয় সত্যিকার ওইসব কাজ এরা করে তাই ওই নামটাই বহাল হয়েছে এ গ্রামের।

হোঁৎকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। ওই সব শাসানি শুনে এবার হোঁৎকাও এগিয়ে আসে। খিদের চোটে জ্বলছিল আগেই, এবার ওদের কথায় জ্বলে উঠে হোঁৎকা ওদের একজনকে ধরে ফেলেছে। বলে হোঁৎকা—কি কইলা? হালায় কলকাতার কুলেপাড়ার জিনিস, আমাগোর ওই একখ্যান গাঁয়ের নাম কইরা ভয় দেখাবো? আমাগোর হাড় ভাঙ্গার আগে তোমার গোঁফখানই খুইলা লমু!

ছেলেটা চমকে উঠেছে। ফটিক নির্বিরোধী টাইপের ছেলে। বিদেশে এসে এসব ঝামেলা সে পছন্দ করে না। তাই ওকে হোঁৎকার হাত ছাড়িয়ে বলে—থাম্ হোঁৎকা। যাও ভাই তোমরা।

ছেলেটা ছাড়া পেয়ে তার সহচর দুজনকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলে—ঠিক আছে। বললাম যাবেন না, তারপরও যদি যান তখন দেখা যাবে।

আমরাও ভাবনায় পড়েছি। গলা শুকিয়ে আসছে। কানা



বিশের নাচের পোজ থেমে গেছে। সে বলে—কাজ নাই গাঁয়ে গিয়ে, ফিরেই চল।

সেই চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি। দোকানদারই জানায়-ফেরার বাস সেই বেলা তিনটেয়।

অর্থাৎ সারা দুপুর শুধুমাত্র লেড়ো বিস্কুট চিবিয়ে বসে থাকতে হবে এখানে। ওদিকে সেই ছেলেরাও দেখছে আমাদের।

গতিক ভালো বুঝছি না। তাই বলি—ফিরেই চল পটলা। চঞ্চলদারাও কেউ এল না, গ্রামের ছেলেরা এসে শাসাচ্ছে, ওখানে নাটক করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

হোঁৎকা গর্জায়—ওগোর শাসানি ছুটাই দিমু!

এমন সময় দেখা যায় দূরের গ্রাম থেকে শ'খানেক লোকজন ছেলেপুলে লাঠি উঁচিয়ে মত্ত কলরবে বড় রাস্তার দিকে ধেয়ে আসছে। ভয় পেয়ে যাই। মনে হয় এবার ওই ছেলেগুলোর কথা না শোনার জন্যই বোধহয় মারধোরই করতে আসছে তারা।

নাটক করতে এসে পটলার জন্যে প্রাণটা বেঘোরে দিতে হবে তা ভাবিনি। বলি—পটলা! এবার মেরে ফেলবে রে!

হঠাৎ দেখি ওই দলবলকে ছুটে আসতে দেখে ওদিকের তিনটি ছেলে উঠি কি পড়ি ভাবে সাইকেলে চেপে বড় রাস্তা দিয়ে দৌড় মারলো, ওই মাঠ থেকে আগত দলেরও কিছু ছেলে ওদের তাড়া করেও ধরতে পারলো না।

ভিড় থেকে চঞ্চলদা এবার বের হয়ে এসে বলে, আইচ হে তুমরা। বুঝলা ভায়া—গাঁয়ে শালোরা কিষ্ট যাত্রা করাবেক; তাই লিয়ে তক্কো, কিষ্ট যাত্রা হবেক লাই, কলকাতার নাটক হবেক। শালোদের হঠাই দিলম্। চলো—

বিবাদের নমুনা কিছুটা বুঝেছি। ওরা তাই আগে এসে আমাদের তাড়াতেই চাইছিল। ফটিক বলে—ওখানে আর নাটক করে কাজ নাই পটলা। টেপরেকর্ডার, লাইট-ফাইট যদি ভেঙ্গে দেয়?

ভাববার কথা। তাই বলি, ঠিক বলেছিস ফটিক। পটলা, তিনটের বাসে ফিরে চল। আর নাটক করে কাজ নাই!

গোবরাও সায় দেয়। কানা বিশে তো আগেই তার মতামত জানিয়েছে। আমাদের অন্যতম অভিনেতা নিতুও তাই বলে—সেই ভালো। ওদের গোলমালের মধ্যে আমরা কেন যাবো?

ভোটের জোরে পটলাও এবার মত বদলায়। তাহলে ফিরেই চল।

ভরপেট মাছ-মাংস ফস্‌কাবার দুঃখে হোঁৎকা ম্রিয়মাণ। কিন্তু ও পক্ষ এবার অন্য মূর্তি ধরে। সিটকে মতো একজন লাঠি উঁচিয়ে বলে—ফিরে যাবে? এ্যাঁ—রং চালাকি পেয়েছো? এ গাঁয়ের নামটা জানো? হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুর। হাড় ভেঙ্গে পাউডার বানিয়ে দোব। মানে মানে গাঁয়ে চলো—'পেলে' করো, ব্যস্। বাপের সুপুত্তুরের মতো ফিরে যাবে।

অন্যজন গর্জে ওঠে—না হলে কলকাতার মুখ আর দেখতে হবেক লাই, লাশগুলান দীঘির পাঁকের লীচে পুঁইতে দিব।

পটলা এবার আর্তনাদ করে ওঠে—চঞ্চলদা?

চঞ্চল এখন গদিচ্যুত। সেই বীরপুঙ্গবই শোনায়—চঞ্চলে কি করবেক হে? গাঁয়ের মাথাটি হেঁট করে চলে যাবে, তা সইব লাই। চলো—

অজ পাড়াগ্রাম। আমাদের নিয়ে গিয়ে ওদের ক্লাবঘরে তুলেছে। উঁচু পুকুরের পাড়—সেখানে খড়ের লম্বা ঘরটাই ওদের লাইব্রেরি-কাম-ক্লাবঘর, গ্রামের বাইরেই।

ওদের দলপতির নাম ভূষণ। সে-ই বলে—আজ গোলমালে মাছটাছ ধরানো হয়নি, ছাগল কাটাও হলো না। এদের মহেশবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আন। কাল দেখা যাবে।

ক্লাবের নিচের পুকুরে স্নান করে গ্রামের মধ্যে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খেতে গেলাম। হোঁৎকা খেতে বসেই গুম হয়ে গেছে। লাল



বোগড়া চালের ভাত, হড়হড়ে বিরিকলাই-এর ডাল, ডিংলার তরকারী, তৎসহ আলুপোস্ত আর টম্যাটোর উগ্র টক॥

হোঁৎকা বলে—পটলা, হেই চঞ্চলদা কনে গ্যাল র‍্যা, ঘেঁটো রুই, মাংস—হালায় গুল দিবার জায়গা পাই নাই।

চঞ্চলদাকে ওরা পাত্তাই দেয়নি, এখন আমরা এদের ডিরেক্ট চার্জে এসে গেছি। হাঁড়িতে জিইয়ে রাখা কই মাছের মতো। হোঁৎকা কোনো-রকমে খাওয়া সেরে উঠলো।

সন্ধ্যার পর থেকেই আটচালায় লোকের ভিড় শুরু হয়েছে। ফাঁকা মাঠে চট, তালাই পেতে ওরা সপরিবারে বসেছে, কেউ দিনভোর মাঠে ধান কেটে এসেছে গান শুনতে। ভটভট শব্দে জেনারেটার চলছে। তার লাল নীল বেগুনি আলোয় কানা বিশে গো গো চশমা পরে মাইকে বাজানো ডিস্‌কো বাজনার তালে বেতালে বিকট ভাবে লম্ব-ঝম্প করে চলেছে।

চড় চড় শব্দে দর্শকবৃন্দের হাততালি পড়ে। কারা আবার চিৎকার করে—এঙ্কোর, এঙ্কোর—অর্থাৎ আবার লাগাও।

আমি নজর রেখেছি সেই আগেকার দল যেন কোনো গোলমাল না করে। অবশ্য সে ব্যাপারে ভূষণ-চঞ্চলদারাও সজাগ। তাদের দেখাও যায় না।

এবার পটলার অমর অবদান 'আমরা কারা' নাটক শুরু হলো। ইঙ্গিত-ধর্মী নাটক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্রেফ পা-হাত ছুঁড়ে গতিময়তা, নাটকীয় মুহূর্ত আনতে চেষ্টা করছি, আর নাটকের চরিত্রগুলোও দুর্বোধ্য, পটলাই তার মানে জানে না। (অবশ্য মানে টানে শুধোলে পটলাও চটে যায়) তবু ওই চট-তালাই-এর শ্রোতারা কেবল হাততালি দিয়ে চলেছে। কলকাতার নাটক না বুঝতে পারলে নাকি তাদের গেঁইয়া বলবে। তাই ঘনঘন মাথা নেড়ে হাততালি দিচ্ছে।

পটলার সরল পুঁটির মতো জীর্ণ বুকের খাঁচাটা ফুলে ওঠে। বলে সে—দেখছিস কেমন নাটক বোঝে এরা?

অবশ্য এ নাটক বিশেষ কোথাও পুরোপুরি ভাবে শেষ করতে পারিনি। কোথাও ইট, কোথাও আধলা, কোথাও টম্যাটো, কোথাও পচা ডিম, আবার কোথাও স্রেফ চিৎকার করে পিনিক্ দিয়ে আমাদের ড্রপ ফেলতে বাধ্য করিয়েছে। এখানে সেটা হলো না। নাটক শেষ হলো। পটলা আর গোবরা দুজনে কুস্তির পোজে দাঁড়ালো—লাল আলো পড়লো, আর হাততালি-সিটি সমানে চলেছে।

পটলা খুব খুশি, পুরো নাটক হয়েছে। বলে সে—রিয়েল নাট্যপ্রেমীদের জায়গা। কাল ভাবছি আর একটা নাটক 'আধখানা রুটি' করবো।

হোঁৎকা রাতেও খেতে বসে দেখে কুমড়োর ঘ্যাঁট উইথ সজনে ডাঁটা, আর চিংড়িমাছের টক।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তুই একাই নাটক করোস। আমরা কাল ভোরেই চইলা যামু। এই হালায় ঘেঁটো রুই, এই তগোর মাংস।

রাত হয়েছে। একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ দরজাটা কাদের বাইরে থেকে বন্ধ করতে দেখে চাইলাম। সারা গ্রাম নাটক দেখে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। নিশুতি গ্রাম। হঠাৎ বাইরে থেকে কাদের দরজা বন্ধ করতে দেখে চমকে উঠি।

এ্যাই! কে—কে?

সাড়া নেই। দরজাটা বাইরে থেকে শিকল তোলা। খোলার উপায় নেই। হঠাৎ দেখা যায় খোলা জানলা দুটোর সামনে দুটো আংরা ভর্তি মালসা, আগুনের তাপ গনগন করছে, আর সেই জ্বলন্ত আংরার উপর কি ফেলে ফুঁ দিয়ে সমস্ত ধোঁয়া দুটো জানলা দিয়ে এই বন্ধ ঘরে ঠেলে দিচ্ছে।

পরক্ষণেই বুঝতে পারি ব্যাপারটা। পটলা বিকট শব্দে হাঁচছে—গোবরাও। উৎকৃষ্ট পাটনাই সুপক্ক লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছে ওই মালসায় আর লঙ্কাপোড়ার ঝাঁঝালো সব ধোঁয়াটা এসে ঢুকছে এই বন্ধ ঘরে।



নাক জ্বালা করছে, চোখমুখ দিয়ে জল ঝরছে আর হাঁচি। ঘরসুদ্ধ সবাই হাঁচছি, চিৎকার করার মতো দমও নেই। মনে হয় এই বদ্ধ ঘরে হাঁচতে হাঁচতেই শেষ হয়ে যাবো। পটলার নাটকের জন্য শহীদ হতেই হবে বোধ হয়।

ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে উঠেছে। ভিতরে একটা চাপা আর্তনাদ, হাঁচির শব্দ ওঠে। হোঁৎকা প্রাকৃতিক ব্যাপারে বাইরে এসেছিল, হঠাৎ ওই লঙ্কাপোড়ার ব্যাপার দেখে সে হকচকিয়ে গেছে। তারার আলোয় দেখা যায় রাস্তায় প্রথম দেখা সেই গোঁফওয়ালা ছেলেটাই তার দলবল নিয়ে এসেছে এবার এদের সযুত করতে।

ওরা তাক বুঝে ধোঁয়া দিচ্ছে, হোঁৎকাও অতর্কিতে লাফ দিয়ে পড়ে ওর পুরুষ্ঠ গোঁফজোড়াটা হাতে পাক দিয়ে দড়ির মতো ধরেছে, অন্যটার মাথার লম্বাচুল ধরে দুটোকে মালসার আগুনে মাথাগুলো এনে ফেলতেই ওরাও লঙ্কার ঝাঁঝে বিকট শব্দে হেঁচে ওঠে।

অন্য দুজন বেগতিক দেখে মালসা ফেলে হাওয়া।

এ দুটো বন্দী ইঁদুরছানার মতো চিঁ চিঁ করছে আর হাঁচছে বিকট শব্দে। ঘরের ভিতর থেকে পটলা-গোবরারা চিৎকার করছে।

সারা গ্রামের লোকজন জেগে গেছে, আবার লাঠি সড়কি নিয়ে তারা চিৎকার করে এসে হাজির হয়।

লম্বা চুলওয়ালা তখন প্রাণের দায়ে হোঁৎকার হাতে একগোছা চুল রেখে পালাবার জন্য লম্ফ দিতে টাল খেয়ে উঁচু পাড় গড়িয়ে শীতের রাতে ভাদুরে পাকা তালের মতো বহু নিচে পুকুরের কাদাজলে পড়েছে।

গ্রামের জনগণ তখন পুকুর ঘিরে তার সন্ধান করছে আর গোঁফ-ওয়ালা ওই বাহারি গোঁফের জন্যই বামাল ধরা পড়ে গেল লঙ্কাগুঁড়ো আংরার মালসা সমেত।

এবার মুক্ত হয়ে আমাও ঘোষণা করি—এখানে কোনো

ভদ্রলোকের বাস নাই। ডেকে এনে নাটক করিয়ে প্রাণে মারতে চায় এরা।

এবার গ্রামের মহেশবাবু আরও দুচারজন মাতব্বর এগিয়ে এসে ভূষণদেরই কড়া স্বরে বলেন—এভাবে গ্রামের বদনাম হতে দেবো কেন?

ভোরবেলাতেই জাল নেমেছে পুকুরে। ক্লাবঘর থেকে মহেশবাবুর চকমিলানো বাড়ির বৈঠকখানার ফরাসে এসেছি। আর আট দশ কেজি নধর মাছ, তাজা খাসী, আর সেই হাঁড়িভাঙ্গা জমাট দই—সব-কিছুর আয়োজনই করেছেন মহেশবাবু।

পটলা বলে—তাহলে আর একপালা হোক 'আধখানা রুটি।' আমি ভয়ে ভয়ে শুধোই—আর 'লঙ্কা দহন' হবে না তো?

মহেশবাবু বলেন—সে হনুমানদের মেরে হাড় ভেঙ্গে ফেলে রেখেছি।

শুনে চুপ করে যাই। হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুর থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরুতে পারলে বাঁচি।

---

www.arisumu.com

Scanned By Arivirus